॥ দ্বিতীয় অধ্যায় ॥

॥ বঙ্কিম উপন্যাসে কাল ॥

- উপন্যাস রচনার ট্র্যাডিশন - উপন্যাসের সাধারণ বৈশিষ্ট্য - শ্রেণীভেদ - রোমান্টিক ও সামাজিক, ঐতিহাসিক, অর্ধ ঐতিহাসিক ও সামাজিক।

ঔপন্যাসিকের কারবার প্রধানতঃ সামাজিক মানুষের জীবন নিয়েই। চরিত্রের সৃষ্টি ও অগ্রগতি বা বিকাশের দিক থেকে অন্তর্জীবন বা inner life এবং ~~outside~~ বহির্জীবন বা outer life সমান গুরুত্বপূর্ণ। চেতনাপ্রবাহ রীতির ঔপন্যাসিকেরা যদিও অন্তর্জীবনকেই মুখ্য বলে গ্রহণ করে নেবার পক্ষপাতী তথাপি বহির্জীবন মূল্যহীন বলে গণ্য হবে না। অন্তর্বাহির মিলিয়ে তবেই একটা ব্যক্তির ব্যক্তিসত্তা ও সমাজসত্তার পূর্ণ পরিচয় লাভ করা সম্ভব। সময়ের ও ঘটনাপ্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ সম্পর্কে অবশ্য ব্যক্তিজীবনে দৈহিক ও মানসিক উভয়বিধ পরিবর্তনই লক্ষ্য করা যায়, কিন্তু তা প্রকাশ ভঙ্গিমা আর বাণীটা অনুভূত অনুভূতির সাহায্যে। জীবনকে বাদ দিয়ে উপন্যাস রচনা এবং যেহেতু জীবনের অস্তিত্ব সময় যাপনে নির্ভর, তাই উপন্যাসের মধ্যে সময়-সূত্রে অবশ্য জীবনের মূল্যায়ন ঘটে। জীবনে যেমন জন্ম-মৃত্যু-সুখ-দুঃখ, ইত্যাদি চক্রাকারে আবর্তিত হয় তেমনই উপন্যাসের নরনারীর জীবনেও সময়ের পারম্পর্য স্বীকার করতে হয়। একজনের সীমিত জীবনে উপন্যাসের কাহিনীর পরিসমাপ্তি না ঘটলে বংশানুক্রমিক কিংবা অন্য কোনও রূপ জীবনচক্র কাহিনীর ধারাবাহিকতা রক্ষা করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ফরসাইট সাগা, পথের পাঁচালী-অপরাজিত প্রভৃতি উপন্যাসের উল্লেখ অনায়াসেই করা যায়। এরূপ দৃশ্যমান সময়কে Physical time বা প্রাকৃতিক সময় বলা যায়। এ সময় Psychological time বা মনস্তাত্ত্বিক কাল থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকার। মনস্তাত্ত্বিক কালের গতি বিভিন্নমুখী, এটা একটা বিন্দুতে অবস্থান করে তার সম্মুখ-পশ্চাৎ এ উভয়দিকে বহুদূর ব্যাপ্ত কালসীমাকে স্পর্শ করতে পারে। এ সম্পর্কে পরে বিশদ বলা হবে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে 'বঙ্কিম উপন্যাসে কাল'। আলোচনা করতে হবে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন -"বঙ্গদর্শনে এবং ~~বঙ্কিম~~ বঙ্কিমের রচনায় বাংলা সাহিত্যে প্রথম আধুনিক যুগের আদর্শকে প্রকাশ করেছে। তাঁর প্রতিভার দ্বারা অধিকৃত সাহিত্য বাংলাদেশের

মেয়ে পুরুষের মনকে একাল থেকে অন্যকালের দিকে ফিরিয়ে দিয়েছে, এদের ব্যবহারে তাদের বুদ্ধিতে পূর্বকালবর্তী ভাবের অনেক পরিবর্তন ঘটে গেল।"[৬] বস্তুত, বঙ্কিম যে যুগে জন্মেছিলেন এবং লালিত ও বর্ধিত হয়েছিলেন তা বাংলাদেশের ইতিহাসে 'আধুনিক যুগ' বলে চিহ্নিত। বঙ্কিমের জীবনের সঙ্গে আধুনিকতার বৈশিষ্ট্যগুলি ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিলো। ঔপন্যাসিকের অন্যতম প্রধান গুণ যে কাল সচেতনতা যার অন্য নাম বাস্তব সচেতনতা বা ঐতিহাসিক সচেতনতা - সেটা বঙ্কিমের ছিলো। ফলে তাঁর রচনা সমকালের সঙ্কীর্ণ সীমা পেরিয়ে অনন্ত ভাবীকালে প্রসারিত থেকেছে। নির্দ্বিধ বলেও একথা সত্য যে, আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে ইতিহাস ছিলোনা, কারণ, অনন্ত সময় ও পরলোকের বিবরণের পরিবর্তে ঐহিক বিবরণ, ঘটনাপ্রবাহ ও কার্যকারণ সম্পর্কে তখন কোনও যুক্তিযুক্ত চেতনা গড়ে ওঠেনি। ঐহিক চেতনার সঙ্গে ঐতিহাসিক চেতনা অভিন্ন ~~সূত্র~~ সূত্রে গ্রথিত। ঐহিক চেতনার সূত্রে প্রকাশ প্রাচীন থেকে আধুনিক যুগে উত্তরণের প্রথম আবশ্যিক শর্ত। বঙ্কিম আধুনিক ছিলেন এই অর্থে যে, তিনি একাধারে সমকাল ও ঐতিহাসিক সচেতন ছিলেন। পূর্বতন কবি ও সাহিত্যিকের সঙ্গে তুলনায় বঙ্কিম ছিলেন যথার্থই আধুনিক মননের অধিকারী। তাঁর সাহিত্যে অনন্ত কালের পরিবর্তে খণ্ড ও সমকালেরই প্রকাশ দেখি। পূর্ববর্তী - সাহিত্য, যথার্থ কালচেতনার অভাবই তার বৈশিষ্ট্য। বঙ্কিমের সাহিত্য পাঠকী অনন্ত কালের পটভূমিকায় রচিত নয় যে সাহিত্য যুগোত্তরী তার থেকে ভিন্ন। তিনি মানুষকে দেখালেন তার যথার্থ পটভূমিকায়, কল্পনাতে নয়, বাস্তবে, কার্যকারণ সম্পর্কের ভিত্তিতে। তাই বোধ, যুগকে মর্যাদা দিয়েও যুগাতীত চিন্তাচেতনা ও সূক্ষ্ম দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় তিনি দিয়েছিলেন। তাঁর সৃষ্টি বিভিন্ন সময় - সাময়িক আগ্রহে যুগাবেগের অনুবর্তী ধ্যানধারণা প্রভাবিত হয়েছিলো। এই বৈশিষ্ট্যের কারণ বলেই তাঁর রচনাবলী কালান্তরেও অম্লান।

উপন্যাসের মূলে নিহিত রয়েছে বাস্তবতা নামে ব্যাপারটা যার ধারণা নিত্য পরিবর্তিত হচ্ছে। জগৎ ও জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার প্রকাশ বা প্রকাশে অনুভবযোগ্য মানস প্রবণতা সকলই ~~অন্তর~~ বাস্তব। বাংলা উপন্যাসের প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিককার ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ভারতের প্রাচীন সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় জন্ম বিষয়ে বাস্তবতার ধারার ইঙ্গিত পেয়েছিলেন। তাঁর মতে, রামায়ণ, মহাভারত, পৌরাণিক সাহিত্য, বৌদ্ধজাতক প্রভৃতির মধ্যে বাস্তবতার সূত্র নিহিতভাবেই আত্মপ্রকাশ করেছে। এছাড়া, পঞ্চতন্ত্র, মঙ্গলকাব্য, চৈতন্যচরিত গ্রন্থ, বৈষ্ণবদের জীবনী প্রভৃতির মধ্যেও বাস্তব সমাজের যথেষ্ট

প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। অর্থাৎ, ব্যাপক অর্থে বাস্তবতার প্রয়োগ(External realities) এখন ক্ষেত্রে নিতান্ত উপেক্ষনীয় নয়। তবে আগে বাস্তবতা সম্পর্কে যে ধারণা প্রচলিত ছিলো এখন আর তা নেই। দর্শনে বাস্তবতার সংজ্ঞার্থ যুগে যুগে বদলেছে। ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্যতাই যদি বাস্তবতার বৈশিষ্ট্য হয় তবে এমন বস্তু জিনিস আছে যা material বা Physical entities হতে পারেনা। তার বেলায় কী হবে? বহির্জগতে অস্তিত্ব না থাকলেও তার বাস্তব হতে বাধা নেই। বস্তুর বর্ণ (?), সুগন্ধ, শব্দ প্রভৃতি মনের ধারণা মাত্র - তাদের স্বরূপ ভিন্ন ভিন্ন বা একই ব্যক্তির কাছে ভিন্ন। মোটকথা, বাস্তবতা শুধু বস্তুগত নেই, আরও আছে; ঔপন্যাসিকের দৃষ্টিতে শুধু নেই, আছে তার অনুভূতিতে।

অনেক সময় সমকালের যথার্থ স্বরূপ আমাদের মতো সাধারণ লোকের চোখে পড়েনা। কিন্তু জিনিয়াস শিল্পী বিভ্রান্ত হননা। তিনি যুগধর্মের যথার্থ সাক্ষী। কালের অমোঘ গতি ও বিবর্তনের প্রকৃতি তার তাঁর লেখায় প্রাণবন্ত হয়ে ফুটে ওঠে। সমাজে কখনো কখনো পশ্চাৎগতি বা অবক্ষয় দেখা দিতে পারে কিন্তু তা সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারাকে কখনও একেবারে স্তব্ধ করে দিতে পারেনা। ঔপন্যাসিক তাঁর সূক্ষ্ম জীবন-দৃষ্টির সাহায্যে জগতের সকল বস্তু ও জীবনধারার অন্তরে যে কর্ম প্রয়াস চলছে তার রহস্য উদ্ঘাটন করেন। অন্যত্র বা সেখানে তার সত্য পরিচয় লাভ করা যায়না। এই সত্যেরই অন্য নাম বাস্তবতা। এ অর্থে রোমান্টিকতা কিংবা আদর্শবাদের প্রকৃতই কোনও বিরোধ নেই। বাস্তবতার যথার্থ তাৎপর্য হলো, সমালোচকের ভাষায় - "সাধারণ লোক চক্ষুর অন্তরালে ক্রিয়মান সমাজ জীবনের অন্তর্নিহিত শক্তিগুলির যথার্থ পরিচয় চিত্ত-সংবেদনের ভিতর দিয়া গ্রহণ করা এবং সমস্ত প্রক্রিয়ার প্রয়োগে তাহাদিগকে সর্বজনীন পরমাদর্শের অভিমুখী করিয়া তোলা।"[৩] অধ্যাপক নীরেন্দ্রনাথ রায় যাকে বলেছেন 'প্রতীয়মানতা' তার মধ্যেও বাস্তবতার বিরাট ব্যবধান।[৪] ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সকল বস্তুই লেখকের অবস্থান সব সত্য না হতেও পারে। সেক্ষেত্রে বাস্তবতার মানে ইন্দ্রিয় গ্রাহ্যতার অর্থে আরও কিছু। শুধুমাত্র ঘটনা, চরিত্র, স্থান ও কালগত পরিবেশের বিস্তৃত বর্ণনার মধ্যে বাস্তবতা থাকেনা, বাস্তবতা থাকে লেখকের মনোলোকের গভীর গভীরে, জীবন সম্পর্কে তাঁর মূল্যবোধের প্রকাশে, জীবন ও জগতে দ্বন্দ্ব ও তার তাৎপর্য

~~৪(ক)~~ ~~আবিষ্কারে~~ বাস্তবতা "Thetruthfully re production of typical characters under typical circumstances."

ছাড়া আর কিছু নয়। (মার্গারেট হার্কনেসকে লেখা এঙ্গেলসের চিঠি, এপ্রিল, ১৮৮৮ থেকে) শুধু সমকালীনতা নয়, সত্যাশ্রয়ও বাস্তবতাবাদী লেখকের অভিপ্রেত হয়ে থাকে। বলাবাহুল্য, যে কোনও দিক থেকেই বিচার করা যায়, বঙ্কিম সাহিত্যে যে যথার্থ বাস্তবের প্রতিফলন ঘটেছে, তাতে সন্দেহ নেই।

সাহিত্যে বা শিল্পে বাস্তববাদ আলোচনা প্রসঙ্গে ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত বঙ্কিমচন্দ্রকে 'রিয়ালিস্ট' রূপে আখ্যাত করেছেন। সাহিত্য বলতে এখানে উপন্যাস ধরলেও অর্থের এতটুকু হেরফের হয়না। তাঁর মতে, "বঙ্কিমচন্দ্রের মূল জিনিষই ছিলেন রিয়ালিস্ট। তাঁহার রোমান্স ধর্মের ভিতরে ছিল মূল্যানুভূতি; আর তৎকালীন সমাজজীবনের বিভিন্ন স্তরে কাজ করিতেছিল যে শক্তিসমূহ তিনি তাহার সন্ধান পাইয়াছিলেন; সেই বৃহত্তর সমাজ-জীবনের কর্মপ্রবাহের সহিত যুক্ত হইয়া জাতীয় জীবনের আদর্শ-আশা-আকাঙ্ক্ষাকে উন্মুখ করিয়া তুলিবার অনুভূতির সাধনা করিয়াছেন তিনি তাঁহার সমস্ত সাহিত্যসৃষ্টির ভিতর দিয়া। তিনি জাতীয় জীবনের একটি বিশেষ আদর্শের সন্ধান পাইয়াছিলেন; সেই আদর্শের প্রতি তাঁহার অটল নিষ্ঠা ছিল; কল্যাণময় সেই আদর্শে তিনি যে জাতীয়-জীবনকে উন্মুখ করিতে চেষ্টা করিলেন, সেইখানেই ত যথার্থ রিয়ালিস্ট বিশ্বাস রাখে। তাঁহার সাহিত্য অঘটনঘটন রস দিয়া যাইয়াও যুক্ত-জীবনের আসরকে মধুর করিয়া আনিয়াছিল, ...।"

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর উপন্যাসগুলিতে কালের যেরূপ ব্যবহার করেছেন তাতে নিম্নলিখিত রূপ বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। (১) তাঁর উপন্যাসের পটভূমিকা বাঁধা পড়েছে সুদূর অতীত থেকে সমকালীন দেশ ও জাতীয় জীবনের বিশাল উদ্দাম প্রবাহে। ঐতিহাসিক কাল, অবক্ষয়ী ~~কাল~~ সামাজিক কাল ও পারিবারিক কালের চমৎকার সংমিশ্রণ তাঁর উপন্যাসগুলিতে লক্ষ্য। (২) ঘটনাতে কাল-পারম্পর্য ও গতিশীলতা সৃষ্টি ও রক্ষা করা হয়েছে। (৩) কাহিনীতে নির্দিষ্ট সময়ের উল্লেখ রয়েছে (সব উপন্যাসে অবশ্যই নেই) যা তাঁর পূর্বে রচিত উপন্যাসকল্প বা অন্য আখ্যায়িকা কাহিনীতে ছিলোনা। (৪) পটভূমিকা সম্পর্কে পূর্ব-পরিকল্পনার পরিচয় পাওয়া যায় এবং এর পেছনে বিশেষ উদ্দেশ্য ছিলো। তাঁর বেশির ভাগ উপন্যাসই আদি-অন্ত সুনির্দিষ্ট কাল-ব্যাপ্তিতে বাঁধা। (৫) ঐতিহাসিক ও অর্ধ-ঐতিহাসিক(বা ইতিহাসাশ্রয়ী) উপন্যাসগুলিতে ইতিহাসের কোনও

বিখ্যাত ঘটনার তারিখের নিরিখে তথা ঘটনাংশগুলিকে সাজানো হয়েছে। প্রায় সকল ক্ষেত্রেই কালের ধারাবাহিকতা স্পষ্ট। (৪) চরিত্রগুলিকে নির্দিষ্ট দেশকালের বাসিন্দা করে তাদের বাস্তবতা ও সম্ভাব্যতা নির্দেশ করেছেন এবং তাদের কালানুসারী দৈহিক ও মানসিক বিবর্তনধারার বিশ্বস্ত রূপ ফুটিয়ে তুলেছেন।

বঙ্কিমের উপন্যাসে কাল-ব্যবহারে একটা দ্বিমুখীতার প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। তাঁর উপন্যাসে সাহিত্য বিচারে সাধারণভাবে দু'ধরণের কাল ব্যবহৃত হয়েছে। (এখানে মনস্তাত্ত্বিক কালকে ধরা হয়নি - কারণ কাহিনীকালের মধ্যে এ কাল সম্পর্কহীন এবং এর ব্যবহার একটু দুরূহ)। সামাজিক উপন্যাসে তিনি তাঁর সমকালাশ্রিত কালের
^ঐতিহাসিক বা অর্ধ-ঐতিহাসিক উপন্যাসে ব্যবহার করেছেন
পটভূমিকায় কাহিনী ও চরিত্রকে দাঁড় করিয়েছেন, তার ^ ঐতিহাসিক কালকে (পটভূমি দূর বা নিকট-অতীত যাই হোক না কেন)। ঐতিহাসিক কালে দেখা যায় দেশের ইতিহাসের কোনো বস্তুত বা বহুটি দুর্দৈব, সমকালাশ্রিত কালে দেখা যায় তথা ঊনিশ শতকীয় বাঙ্গলার নরনারী ও সমকালীন জীবনধারার চিত্রায়ন। কিন্তু যাকে বলেছি এই জন্যে যে, তাঁর কোনো কোনো উপন্যাসে ঐতিহাসিক বাস্তবতার মধ্যে সমাজ-পরিবার-ভিত্তিক বাস্তবতার চমৎকার সমন্বয় ঘটেছে। তাছাড়া, তাঁর বিভিন্ন শ্রেণীর উপন্যাসের লোকাশ্রিত ধর্ম একই সঙ্গে যুগকালের প্রতীতি এনে দিয়েছে। * কাহিনী অতীতের না বর্তমানের - এই প্রশ্ন পাঠকমনে জেগে থেকেছে। উদাহরণস্বরূপ, দেবী চৌধুরাণী প্রভৃতি উপন্যাসে সুচিহ্নিত কালের প্রতিষ্ঠিত বোধ কালের দুর্জ্ঞেয়তাই প্রকট করে। আনন্দমঠের কালকে অতীত অথবা ভবিষ্যৎ - কোন্ কালখণ্ডের পর্যায়ে ফেলব? কাহিনীকাল অবশ্যই অতীতের। কিন্তু স্রষ্টা ও দ্রষ্টা ঔপন্যাসিক এখানে অতীত ইতিহাসের কথা বলতে বসে' অনাগত ভাবী-জীবনের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়ে ফেলেছেন। তাই বলছিলাম, বঙ্কিমের উপন্যাসে কালের প্রয়োগ দ্বিমুখী ধরণের।

বঙ্কিমের যে সকল উপন্যাসের পটভূমিতে রয়েছে ঐতিহাসিক কাল সেখানে সাধারণতঃ দু'দিক থেকে ইতিহাসের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে। এক, উপন্যাসের কাহিনীর চলমানতা ও ধারাবাহিকতা দেখাতে ব্যবহৃত হয়েছে কোনো বিখ্যাত ঐতিহাসিক ঘটনার সংঘটন লগ্ন এবং সেই বিন্দু থেকে কাহিনীর উৎস-অনুপাত প্রদর্শনে, দুই, ইতিহাস প্রসিদ্ধ কিছু ব্যক্তি ও ঘটনার একক বা যৌথভাবে তাঁর কাহিনীর আকর্ষণ বাড়াতে এবং জীবনের বিস্তৃত প্রেক্ষাপটে ক্ষুদ্র মানব-মানবীর কর্মপ্রচেষ্টায় অসাধারণত্ব

আরোপ করতে । কোনো কোনো ক্ষেত্রে গল্প কাহিনী বা চরিত্রের সঙ্গে ইতিহাসের যোগ তেমন নিবিড় নয় । দৃষ্টান্ত হিসেবে মৃণালিনী বা আনন্দমঠ প্রভৃতি উপন্যাসের উল্লেখ করা যায় - যদিও এ ব্যাপারে নানা সমালোচকের নানা মত । ইতিহাসের যে কালকে তিনি ব্যবহার করেছেন তা বাংলা তথা ভারতের ইতিহাসের এক একটি সঙ্কটময় কাল । এরূপ সঙ্কট কালকে ব্যাখ্যা করা যায় ইতিহাসের যুগসন্ধি হিসেবে। এক যুগের অবসানে নোতুন যুগের অভ্যুদয়ের মাঝামাঝি সবচেয়ে জটিল কালই যুগসন্ধি । আমাদের "ইতিহাসের প্রধান যুগসন্ধিগুলি তাঁর কয়েকটি উপন্যাসের কাহিনীবিন্যাস রচনা করেছে ।"

ষোড়শ শতকের শেষভাগে বাংলাদেশে(বিশেষ করে দক্ষিণ-পশ্চিম প্রত্যন্ত বাংলায়) এবং উড়িষ্যায় কিছুকাল প্রবল পাঠানদের চেষ্টায় মোগল-পাঠান সংঘর্ষ দুর্গেশনন্দিনীর অবলম্বন । কপালকুণ্ডলার পটভূমিতে ঐতিহাসিক কাল থাকলেও তা যুগসন্ধির জটিল ভাঙাগড়ার কাল নয় । এ উপন্যাসের উপকাহিনীতে যে সকল ঐতিহাসিক ঘটনা ও চরিত্রের অবতারণা করা হয়েছে সেগুলি সপ্তদশ শতকের গোড়ার দিকের ~~মোগলের~~ ভারত-ইতিহাসের এক বিশেষ অধ্যায়ের সঙ্গে যুক্ত । মৃণালিনীর কাহিনী গড়ে উঠেছে প্রাচীন ও মধ্যযুগের সন্ধিলগ্নে বাংলার ইতিহাসের এক তমসাবৃত অধ্যায়কে কেন্দ্র করে । মুসলমান-অভিযান(?) সমকালীন তুর্কী আক্রমণকালীন বাংলা বিজয়(নবদ্বীপ দখল) মৃণালিনীর কাহিনীর প্রেক্ষাপট রচনা করেছে । চন্দ্রশেখর-এর পটভূমিকায় রয়েছে পলাশীর যুদ্ধের পরবর্তীকালের বাংলার ইতিহাসের এক বিশেষ সঙ্কট কাল । বাংলাদেশে দীর্ঘ নবাবী শাসনের অবসান ও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর ক্রমবর্ধমান প্রতিষ্ঠালাভ এ উপন্যাসের কাহিনীতে বিধৃত । রাজসিংহ উপন্যাসে বর্ণিত রয়েছে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে মোগল বনাম রাজপুত-শক্তির দীর্ঘকালব্যাপী রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের কথা । যথার্থ যুগসন্ধিকাল না হলেও এই প্রবল সংঘাতের মধ্যে ইতিহাসের যুগ-পরিবর্তনের ইঙ্গিত লক্ষ্য করা যায় । আনন্দমঠ উপন্যাসখানি বাংলাদেশে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর(১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দ) ও সন্ন্যাসী বিদ্রোহের পটভূমিকায় রচিত । দেবীচৌধুরাণীর কাল-পটভূমি মন্বন্তরের কয়েক বৎসর পরবর্তী । একাল "সেই ১৭৭৩-১৭৮৭ সালের মধ্যবর্তী অরাজকতায়(ইংরেজ শাসন সবেও সুপ্রতিষ্ঠিত ~~সময়ের~~ হবার আগে) ভবানী পাঠক (ভোজপুরী ব্রাহ্মণ), মজনু শাহ (মেওয়াতী মুসলমান) প্রভৃতি [illegible]~~(?)~~ ডাকাতদলের লুটপাটের আমল ।" মোগল সাম্রাজ্যের

লবণশেষের কালে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বাংলার ইতিহাসের এক সংকট কাল সীতারাম উপন্যাসের ভিত্তি। ইতিহাস মুখ্যভাবে এসেছে দুর্গেশনন্দিনী, রাজসিংহ ও সীতারামের কাহিনীতে আর গৌণভাবে প্রবেশ করে কাহিনীতে গতির সঞ্চার করেছে অন্য পাঁচটি উপন্যাসে। শুধু ঐতিহাসিক বা অর্ধ-ঐতিহাসিক (রোমান্স) উপন্যাসের ক্ষেত্রেই নয়, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সামাজিক-পারিবারিক উপন্যাস কিংবা তথাকথিত 'প্রচারের কাল' এর ক্ষেত্রেও সামগ্রিকে বিবর্তনের নানা মুহূর্তকে চিরস্থায়ী স্থান দিয়েছেন।

বাংলা তথা ভারত-ইতিহাসের প্রধান মুহূর্তগুলিকে তাঁর উপন্যাসের কাল-পটভূমি করার পশ্চাতে বঙ্কিমের বিশেষ উদ্দেশ্য ছিলো। তিনি ছিলেন ইতিহাস-সচেতন শিল্পী। বাঙালীর বর্তমান হীনাবস্থা তাঁকে সর্বদা পীড়িত করতো। বাংলাদেশ, বাঙালী জাতির সমাজ-সংস্কৃতিকে তিনি গভীরভাবে ভালোবাসতেন এবং তাঁর যে জাতীয় জাগরণের স্বপ্ন ছিলো সেজন্যই স্বভাবতো তাঁর স্বদেশ ও স্বজাতি সম্পর্কে জানবার আগ্রহ ও কৌতূহল অঙ্কুরিত হয়ে থাকবে। কালক্রমে পাশ্চাত্য শিক্ষায় লব্ধ বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা, দার্শনিক বিচার পদ্ধতি ও যুক্তির অন্তর্দৃষ্টি তাঁর আগ্রহ ও কৌতূহল বাড়াতে প্রেরণা সঞ্চার করেছে। বাংলা ও বাঙালির অতীত সম্পর্কে তাঁর এখন কৌতূহলের অভিব্যক্তি হিসেবে দেখা গেছে, একমাত্র রাজসিংহ ছাড়া তাঁর সকল উপন্যাসই শুধু বাংলার অতীত জীবনের বস্তুকে অবলম্বন করে পটভূমি ভিত্তি করে রচিত। অন্য কারণও আছে। সমকালীন শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের অধিকাংশেরই ধারণা ছিল, জাতি হিসেবে বাঙালী হীনবীর্য, তারা স্বভাবতই দুর্বল ও পরমুখাপেক্ষী, তাদের ঐতিহ্যে 'যুদ্ধ' শব্দটিই অনুপস্থিত। বঙ্কিম এরূপ ধারণার সত্যতা স্বীকার করেননি, বরং বিরোধিতা করেছেন। কিন্তু সর্বে সর্বে একথাও অস্বীকার করেননি যে, বাঙালির দৌর্বল্য যদি কিছুমাত্র থাকে তবে তার কারণ শারীরিক বলের হীনতা। তিনি বলেছেন শারীরিক বল বাহুবল নয়। বাহুবলের দিক দিয়ে বাঙালি এখনও দুর্বল নয়, কখনও দুর্বল ছিলো না। শারীরিক বলের প্রয়োগে বাহুবলের কিছু প্রকাশ ঘটে মাত্র। বাঙালির দুর্বলতার কারণ (দৈহিক বা শারীরিক বলের) অনেকে বলেন, প্রতিকূল জলবায়ু (উষ্ণ, আর্দ্র ও স্বাস্থ্যনাশক); অনেকে বলেন, খাদ্যের অপকৃষ্টতা ও তার প্রকৃতি; অনেকে বলেন সামাজিক কুসংস্কার, বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ প্রভৃতি। বঙ্কিমও স্বীকার করেন, সবশেষে বলতে গেলে, বাঙালির দুর্বলতার কারণ ভূমির উর্বরতা

ও উর্বরা শক্তি, উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ু এবং দেশাচার অর্থাৎ এটা সম্পূর্ণতই বাহ্য প্রকৃতির ফল ।

এ পর্যন্ত বলেও তিনি ক্ষান্ত হননি । তিনি আশাবাদী, তাই আশু সম্ভাবনার কথা কোনোমতেই বিস্মৃত হননা । তিনি বলেন, যদি কখনও এ সকল প্রকৃতির অবস্থার পরিবর্তন ঘটে তখন বাঙালির সাময়িক শারীরিক বলহীনতা কেটে যাবে । শারীরিক বলহীনতার নিক্ষেপ্ত, হতাশাগ্রস্ত যে সকল বাঙালি এখনও পরাধীনতার জ্বালা অনুভব করেনা, উদ্যম, ঐক্য, সাহস ও অধ্যবসায় - এই চারিগুণে তাদের মধ্যেও স্বাধীনতার স্পৃহা জাগতে পারে । কখনও যে এই গুণগুলো বাঙালি-চরিত্রে সমন্বিত হবে না তা বলা সম্ভব নয় । বাঙালির জাতীয় চরিত্র সম্পর্কে তাঁর এ মতের প্রাথমিক ধারণা তাঁর প্রথম যুগের উপন্যাসগুলিতেও লাভ করা যায় । ~~[illegible]~~ উপন্যাস ও প্রবন্ধের মূলরীতি ও উদ্দেশ্য ভিন্ন হওয়ায় এ ধারণা ~~তাঁর~~ প্রথম দিকের উপন্যাসে বীজাকারেই ছিলো । কিন্তু উপন্যাসে যা ছিলো অর্ধস্ফুট, প্রবন্ধে নিবন্ধে সে ধারণারই ~~[illegible]~~ জোরালো প্রকাশ দেখি । শেষদিকে, 'সীতারাম' উপন্যাসে সীতারাম চরিত্রে একটু বিস্তৃত আকারে বাঙালি-শৌর্যবীর্যের কিছু সমাবেশ ঘটিয়ে বাঙালির অতীতের কলঙ্ক অপনোদনের প্রয়াস তিনি পেয়েছিলেন । তাঁর নিজের কথাতেই এর কারণ সম্পর্কে জানতে পারা যায় । "সকলেরই বিশ্বাস, বাঙ্গালী চিরকাল দুর্বল, চিরকাল ভীরু, চিরকাল স্ত্রী-স্বভাব, চিরকাল ঘুষি দেখিলেই ~~[illegible]~~ পলাইয়া যায় । ...... এ নিন্দার কোন মূল ইতিহাসে পাইনা । .... কিন্তু বাঙ্গালী যে পূর্বকালে বাহুবলশালী, তেজস্বী, বিজয়ী ছিল, তাহার অনেক প্রমাণ পাই ।" (বিবিধ প্রবন্ধ, বাঙ্গালার কলঙ্ক, পৃ০ ৪২১) । তেজো বাঙালির এই দুরপনেয় কলঙ্ক দূর করারজন্য তিনি যে ব্রত আরম্ভ করেছিলেন, 'সীতারাম' উপন্যাসের রচনা মাধ্যমে তাঁর সে ব্রত সার্থক হয়েছিলো ।

উপন্যাসে ঐতিহাসিক কাল ও চরিত্র-সমাবেশে তিনি প্রমাণ করেছেন - বাঙালির চরিত্রে কখনও শৌর্যবীর্যের অভাব ছিলোনা । বর্তমান জীবনভাবনা ও মূল্যবোধকে অতীতের কাহিনীর মধ্যে (বিশেষভাবে সংকটপূর্ণ পরিস্থিতিতে) প্রবেশ করে তিনি এই মত প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন যে, জাতি হিসেবে নিজেদের দাবীকে প্রতিষ্ঠা করার পথে বাঙালির এখন আর কোনও বাধা নেই । তাছাড়া, ঐতিহাসিক যুগসন্ধির কালে ~~ত্রি~~

স্থিতিশীল সমাজ ও ব্যক্তি মানুষের মধ্যে হঠাৎ জাগে জঙ্গমতা। বস্তুত অচেতন জীবন ধারায় কলরোল তোলে প্রাণের বিপুল সাড়া। এ সময়কে প্রেক্ষাপট করে কাহিনী ও চরিত্রগুলিকে অভিনবিত রূপদান করা যায়। বাইরের সমাজজীবনের অস্থিরতা ছাপ ফেলে অন্তর্জীবনে। ফলে অনিবার্য হয়ে ওঠে দ্বন্দ্ব। প্লটের গাঢ়বন্ধ গঠনে এই দ্বন্দ্বের প্রয়োজনীয়তা অবশ্যই স্বীকার করতে হয়। বস্তুত সমকালীন জটিল ও অনিশ্চিত পরিস্থিতিতে জাগরণ/, বহুশাখিক বাঙালি গণমানসকে দেশ ও জাতি সম্পর্কে ~~সচেতন~~ সচেতন করে সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ গড়ার ক্ষেত্র প্রস্তুত করার অভিপ্রায়েই বঙ্কিম ~~ঐতি~~ ইতিহাসের অতীতে তাঁর তীক্ষ্ণ সন্ধানী দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছিলেন।

ঐতিহাসিক সচেতনতা না থাকলে নানাপ্রকার কুসংস্কার, প্রবৃত্তির দুর্বোধ ও দৈব বিশ্বাসের নিকট আত্মসমর্পণই একমাত্র কাম্য হয়ে ওঠে। একারণেই জাতীয়তাবোধের বিকাশ দূরে থাক, তার উন্মেষও কোনোভাবে কল্পনা করা যায়না। 'বিবিধ প্রবন্ধের' অন্তর্গত 'বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা' ও 'বাঙ্গালার ইতিহাসের ভগ্নাংশ' প্রবন্ধের মাধ্যমে বঙ্কিমচন্দ্র এ কথাটাই প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস পেয়েছেন যে যাদের পূর্ব মাহাত্ম্যের ঐতিহাসিক স্মৃতি থাকে তারা সে মাহাত্ম্য রক্ষার চেষ্টা করে। তা হারালে পুনঃপ্রাপ্তির প্রয়াস পায়। যে বাঙালি তার পূর্ব পুরুষকে ছিল দুর্বল, অসার ও গৌরবহীন বলে জানে তারা স্বভাবতই ঐ সকল অবস্থার কবলিত হয়, অবস্থান্তর প্রাপ্তির চেষ্টা করেনা। চেষ্টা ছাড়া সিদ্ধি হয়না। তাছাড়া, কোনও দেশের ইতিহাস ~~লিখ~~ লিখতে গেলে সে দেশের ইতিহাসের প্রকৃত 'ধ্যান' সুস্পষ্ট করতে হয়। অর্থাৎ অতীত ঐতিহ্যের (অবশ্য ইতিহাসের অর্থই সত্যমূলক অতীত ঘটনাবলীর বিবরণ) স্বরূপ অবগত হয়ে জানতে হবে বর্তমান তার স্বাভাবিক পরিণাম কিনা এবং তার ভেতর দিয়ে গৌরবময় ভবিষ্যৎ সৃষ্টি করা সম্ভব হবে কিনা - [illegible] সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে।

অধিকাংশ মানুষেরই প্রবৃত্তিতে সমাজের স্থিতিশীলতায় টিকে থাকার একটা গূঢ় গোপন আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু সাধারণের থেকে আলাদা সচেতন মানসিকতা এর বিরুদ্ধাচরণ করে। তাছাড়া, অবস্থা যাই হোক না কেন, উন্নতির আশা ত্যাগ করে পিছিয়ে যেতে কে চায়? পাশ্চাত্য শিক্ষার সর্বে সম্পর্কশূন্য জনগোষ্ঠীর মুষ্টিমেয় অংশ পুঁটি খোলার মধ্যে আপনার তালে আপনিই আবদ্ধ। অতীত বর্তমানকে গড়ে, আর বর্তমানের মধ্যে দিয়েই ভবিষ্যতের প্রতি অঙ্গুলি-নির্দেশ করে। প্রয়োজনের তাগিদেই গৌরবোজ্জ্বল ~~অতী~~ অতীতের পানে দৃষ্টি ফেরাতে হয়। আর তা করতে হয় আত্মপ্রত্যয় বোধের জন্য ~~ই~~ নয়,

কিংবা দিনগত পাপক্ষয় করে বর্তমানের জটিল ও সমস্যাসংকুল জীবনযাত্রার সমস্যাকে পাশ কাটিয়ে যাবার জন্যও নয়, সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎকে আরও উজ্জ্বল করে গড়ে তুলবার জন্য । কিন্তু কোন্ সে কাল যাকে অবলম্বন করে আমাদের ভবিষ্যতের সুখস্বপ্ন সার্থক হবে ? সে অবশ্যই অতীত - দূর কিংবা নিকট কিন্তু অস্পষ্ট । প্রবন্ধের মাধ্যমে যাকে বুদ্ধির দ্বারে পৌঁছে দিলেন ~~[illegible]~~ বঙ্কিম, উপন্যাসের আধারে তাকেই পরিবেশন করে ঢুকিয়ে দিলেন প্রতিটি বাঙালির হৃদয়ের মণিকোঠায় । উপন্যাসের মধ্যে বাংলার ইতিহাস তথা ভারতের ইতিহাসের বিভিন্ন যুগসঙ্কটের রূপায়ণ তাই গভীর ইঙ্গিতবহ এবং সার্থক ।

বঙ্কিমচন্দ্র নিজেও ছিলেন উনিশ শতকের বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ভাঙাগড়া অর্থাৎ যুগসন্ধির দ্রষ্টা এবং সমকালেরই লেখক । সুতরাং যুগসন্ধির সকল বৈশিষ্ট্যকে আত্মস্থ করেই যুগান্তরের বার্তাবহ রূপে তাঁর আবির্ভাব । তাঁর পরিণত ভাবনায় প্রতিফলিত হল ইতিহাসের সঙ্কটমুহূর্তের ধ্যানধারণা তথা মানসবিকাশ । পুরনো ধ্যানধারণা ও মূল্যবোধের অবসান, বৈজ্ঞানিক স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গীর প্রসার এবং সামন্ততান্ত্রিক সমাজ-কাঠামোর পরিবর্তে ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার অভ্যুদয়ের ঐতিহাসিক লগ্নে দৈবনির্ভরতা, শাস্ত্র ও পণ্ডিত বচনের পরিবর্তে তিনি যুক্তি ও কর্মনিষ্ঠা দাবী করলেন । মানুষের কর্মশক্তি আর মহিমা ব্যবহারিক জীবনের চাপে লুপ্ত হয়েছিল বলেই তিনি তাকে প্রতিষ্ঠার জন্য অতীত ইতিহাসের দ্বারস্থ হয়েছিলেন । ইতিহাসের অস্পষ্ট যুগের প্রতি তাঁর পক্ষপাতিত্বের বিশেষ কারণও আছে । প্রকারান্তরে সমকালীন বাস্তব জীবনচিত্র, নরনারীর প্রত্যক্ষ বেদনা ও আশা-কল্পনা চিত্রণের অনায়াস পন্থাই ~~[illegible]~~ হলো নিছক প্রত্যক্ষ বাস্তবতা থেকে দূরে অবস্থান এবং কল্পনা-প্রসারতায় রোমান্স সৃষ্টি । বাস্তবিক পক্ষে, উপন্যাসের মধ্যে যে জীবনচিত্রের সাক্ষাৎ আমরা পাই তা বাস্তবের হুবহু প্রতিলিপি নয় । কারণ সাহিত্য লৌকিক বাস্তব নয় । যা ঘটে শুধু তাই নয়, যা ঘটতে পারতো সেটা প্রকাশ করাও সাহিত্যের দায়িত্ব । ফটোগ্রাফের সঙ্গে অঙ্কিত চিত্রের যে ধরণের পার্থক্য এও অনেকটা সেরূপ । ঐতিহাসিক কালের আধারে স্থাপিত উপন্যাস প্রত্যক্ষ বাস্তব না হয়েও অধিকতর বাস্তব । সুতরাং সাহিত্যে বাস্তবতা ফুটিয়ে তুলতে বঙ্কিম যে ঐতিহাসিক কালকে সাদরে বরণ করে নেবেন তাতে আর ~~[illegible]~~ বিচিত্র কি ।

যে কাই হোক, ইতিহাস সম্বন্ধে সচেতনতায় রোমান্সের দুয়ার হঠাৎ খুলে যেতে পারে। বর্তমান যুগচেতনিতে যাকে সম্পূর্ণ অবাস্তব বলে মনে হয়, ইতিহাসের অস্পষ্ট আলো-আঁধারী যুগের মধ্যে তাকেও 'বাস্তব সত্য' বলে ধারণা করা যায়। একসময়ের অভিজ্ঞতালোচিত শাস্ত্র-ধর্মবিশ্বাস, কুসংস্কার ইত্যাদি সরল সত্য বলে স্বীকৃত তথা হয়তো এযুগের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে অচল কিন্তু তাই বলে তাকে অবাস্তব বা অলীক মনে করে উড়িয়ে দেওয়া যায়না। যথা উনিশ শতকে ইংরেজ শাসনের শেষার্ধে আমাদের অতীতচারী কল্পনা বিকাশের সহজ পথ খোলেনা। তাকে এক্ষেত্রে হল মধ্য পথের মিশাল, ঠিক তেমন রোমান্টিক কল্পিত-কল্পনার নিশ্চিত আশ্রয়। শিশির সমালোচক পোশাক ধ্যানধারণ এ অবস্থার বড়ো সুন্দর বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর মতে, সমকালের "বর্তমানে সাফল্য না পেয়ে সেই নবজাগ্রত জীবনস্পৃহা, মানুষের মহিমা, অতীতের গৌরবময় কল্পনা তার পরিপূরণ খুঁজেছিল মানসলোকে, বিস্ময়কর উপাখ্যানে, অদ্ভুত রসে, আত্মস্ফূর্তিতে। বাঙালি মানসলোকের বিকাশে একদিকে ছিল রামমোহন-ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 'বুদ্ধির মুক্তি'র অভিযান, অন্য দিকে (বিশেষ করে ১৮৫০ সালের পর থেকে) কল্পনা-আবেগ-ভাবালুতার অবাধ আত্মস্ফূর্তি - যা দেখা যায় এদের উপাখ্যানে ও সাহিত্যের সৃষ্টি সম্ভারে। ঐতিহাসিক রূপকথার দুর্গেশনন্দিনী রোমান্টিক কাহিনী রচনায় বঙ্কিমের তাই অবদান।"[১২]

সুতরাং ঐতিহাসিক উপন্যাসের (ইতিবৃত্তমূলক এবং রোমান্স সহ) শ্রেষ্ঠই নয়, সামাজিক উপন্যাসের মধ্যেও বঙ্কিম অতীতকাল ও অদ্ভুত কাহিনীর অবতারণা ঘটিয়েছেন। তাঁর অনেকগুলি যে সকল গবীর বাস্তব সত্যে সাহিত্য [illegible] সমাজের পারিপার্শ্বিক সম্পর্ক নির্ণয়ের মধ্য দিয়ে পরিণতির পথে এগিয়ে গেছে। এ সকল উপন্যাসের মধ্যেও স্থান ও কালগত ঐক্য যথারীতি রক্ষা করতে চাওয়া হয়েছে, যদিও সকল ক্ষেত্রে এ সম্বন্ধি পুরোপুরি রক্ষার বাধা অতিক্রম হয়নি। ক্লাসিক্যাল নাটকের কালসমন্বিত রক্ষা করা এখন অবশ্য সম্ভবও নয়। তা সত্ত্বেও বঙ্কিমের পরিমিতিবোধ প্রশংসনীয়। কাহিনীতে অকারণ উচ্ছ্বাস বাহুল্য ও অবাস্তব প্রসঙ্গের অবতারণার দ্বারা সুদীর্ঘ ও অলুবিত বিস্তারের পক্ষপাতী তিনি কোনও দিনই ছিলেননা।

সাধারণভাবে ঐতিহাসিক কিংবা ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাসে কালের ভিন্ন ভিন্ন (অন্ততঃ তিনস্তর বিশিষ্ট) রূপ ফুটে ওঠে। বঙ্কিমের উপন্যাস সম্বন্ধেও একথা সমান প্রযোজ্য।

তার একদিকে থাকে ইতিহাসের বিশেষ কাল, মাঝখানে থাকে উপন্যাস রচনা ও প্রকাশের কাল অর্থাৎ লেখকের সমকাল এবং অন্যদিকে থাকে পাঠকের কাল যা পূর্ব-বর্তী দু'টি কালের মতো কখনও স্থির থাকেনা, ক্রমাগতই এগিয়ে চলে - বিবর্তিত হয়। ফলে, লেখকের সমকালীন পাঠক এবং ক্রমশ: দূরবর্তী কালের পাঠকের চিন্তা-চেতনা ও বিশ্লেষণে এ সকল উপন্যাসের কাল-পার্থক্য স্পষ্ট হতে থাকে। আনন্দমঠ - দেবী চৌধুরাণীর কাল বঙ্কিমের সমকালীন পাঠকের কাছে যতোটা দূর এবং অস্পষ্ট ছিলো তার তুলনায় সাম্প্রতিক পাঠকের কাছে এর দূরত্ব এবং অস্পষ্টতা উভয়ই বেশি। সাধারণ সামাজিক-পারিবারিক উপন্যাসে এ প্রকার ত্রি-স্তরীয় কালরূপের পরিবর্তে সময়ের দ্বি-স্তরীয় বিন্যাস নজরে পড়ে। লেখকের সমকালীন পাঠকেরা সামাজিক-পারিবারিক উপন্যাসে নিজেদের কালকে খুঁজে পায়। পরবর্তীকালের পাঠকদের কাছে বিষবৃক্ষ, কৃষ্ণ-কান্তের উইল প্রভৃতি উপন্যাসের রচনা কাল ও ঘটনাকাল ক্রমেই দূরে সরে যেতে থাকে। যদিও এগুলির ~~[illegible]~~ কাহিনী ও চরিত্র তাদেরও সমকালীন বলে প্রতীতি জন্মে। কিন্তু ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাসে পাঠক কখনও স্বকালের প্রতিরূপ খুঁজে পায়না। যে কোনও পাঠক কল্পনাপ্রবণতায় সচেতনভাবে নিজের কালকে অতীতের পরিপ্রেক্ষিতে স্থাপন করতে পারে। বঙ্কিমের উপন্যাসের কাল-পরিকল্পনা এবং রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এ বিষয়ে তাঁর পার্থক্য নির্ণয় করতে গিয়ে ডঃ গোপিকানাথ রায়চৌধুরী যা বলেছেন তা যথার্থ।[১১] আমাদের পর্যবেক্ষণও তাঁর মতই সমর্থিত হয়। তিনি বলেছেন - "বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর উপন্যাসসমূহে কাল-পারম্পর্যকে সর্বত্র অব্যাহত রাখতে চেয়েছেন (কেবল 'রজনী'তে আঙ্গিকগত নূতনত্বের জন্য কাল-বিন্যাস রীতিতে কিছু পরিবর্তন আনতে হয়েছে)। বঙ্কিমচন্দ্রের ইতিহাসানুবন্ধ দূরপ্রসারী কল্পনা কালের সীমাকে অনেক ক্ষেত্রেই বহুদূর বিস্তৃত করে দিয়েছে - বহুবর্ষব্যাপী সেই সময়-সীমা।" তিনি আরও বলেছেন -"বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর বহু উপন্যাসে 'খণ্ড' বিভাগের সাহায্যে যে কালগত ব্যবধান সৃষ্টি করতে চেয়েছেন, রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে সেই শিল্পরীতির প্রয়োগ দেখিনা।"

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস একাধারে ঘটনাপ্রধান ও নাটকীয়। ফলে নাটকীয়তার কিছু গুণ তাঁর উপন্যাসে স্বভাবতই লক্ষিত হয়। কালঘটিত ব্যাপারেও এই ত্রিগুণের প্রয়োগ দেখা যায়।' বঙ্কিম উপন্যাসে কাল' এর উপসংহারে বঙ্কিমের কাল ব্যবহারের

বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আমরা কিছু বক্তব্য উপস্থাপিত করা বোধহয় অসংগত হবেনা । এক, বঙ্কিমের উপন্যাসে সময়ের তুলনায় ঘটনা দ্রুতগতি সম্পন্ন । ঘটনাপ্রধান উপন্যাসের এটা একটা বৈশিষ্ট্য হতে পারে । দুই, বঙ্কিমের উপন্যাসে কালের প্রবাহ সূচিত হয়েছে নির্দিষ্ট সন-তারিখ বা ঋতুর উল্লেখের মাধ্যমে । বিশেষ বিশেষ ঋতু বা মাসের উল্লেখ ঘটনার প্রবাহে সময়ের অগ্রগতির সূচক । ঐতিহাসিক উপন্যাসে শুধু নয়, সামাজিক উপন্যাসের কাহিনীকালেও ঋতু বা মাসের উল্লেখ করা হয়েছে । দুর্গেশনন্দিনী, মৃণালিনী ও চন্দ্রশেখর প্রভৃতি উপন্যাসে সময়ের সাথে ঘটনা দ্রুতগামী । আবার উপরে নির্দেশিত উপন্যাসগুলি ছাড়া বিষবৃক্ষ, কৃষ্ণকান্তের উইল প্রভৃতি উপন্যাসেও সুস্পষ্ট ইঙ্গিতের মাধ্যমে কালপ্রবাহ এবং তার খণ্ড বিভাগ প্রদর্শিত হয়েছে । তিন, উপন্যাসগুলির বর্ণনা অংশে সময় সাধারণত দ্রুতগামী কিন্তু সংলাপ বা আত্মিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ কালে মনে হয় সময়ের রথচক্র যেন থেমে থাকে । আনন্দমঠ, দেবীচৌধুরাণীর কোন কোন অংশে বর্ণনা বা তত্ত্বালোচনার ক্ষেত্রে এরূপ মনে হওয়া খুবই স্বাভাবিক। চার, ঘটনার স্থান পটভূমি বদল হবার সঙ্গে সঙ্গে কালও বিবর্তিত হয় । আবার একই স্থানে ঘটনা বাঁধা পড়েছে অথচ বিশেষ পরিবর্তিত পরিস্থিতি সময়প্রবাহকে পার হয়ে অন্য সময়ে উত্তীর্ণ করে দিয়ে - এমন দৃষ্টান্তেরও অভাব নেই । পাঁচ, বর্ণনায় অতীতচারিতা বা চরিত্রের স্মৃতি চারণের ফলে কাহিনীর স্বাভাবিক কালগতি ব্যাহত হয় । ফলে অতীত ও বর্তমান সময়ে সামগ্রিকভাবে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হলেও বাস্তবতার উপস্থাপনে এর তাৎপর্য অনস্বীকার্য । মোটকথা, জীবনে আকস্মিকতা বা নাটকীয়তাকে অস্বীকার করা যায়না সত্য, কিন্তু উপন্যাসে জীবনের সকল ঘটনাই আবদ্ধ হয় সুদৃঢ় কার্যকারণ পরম্পরায় যার অবলম্বন কালের প্রবহমান স্রোত । স্বাভাবিকতা সূত্রে গ্রথিত বস্তু ও দৃশ্য কালে দূরত্বের ও অখণ্ড কালের প্রতীতি এনে দেন সফল ঔপন্যাসিক। বঙ্কিমের উপন্যাসেই প্রথম স্পষ্ট কালানুসরণ ধরা পড়ে ।

॥ উপন্যাস রচনার ট্রাডিশন ॥

আমাদের এখনকার আলোচ্য 'উপন্যাস রচনার ট্রাডিশন' বাংলা উপন্যাসের প্রসঙ্গেই আলোচিত হবে । তবে তুলনার ক্ষেত্রে শুধু ইংরেজি উপন্যাসের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হতে পারে । ইংরেজি উপন্যাসের প্রথম যুগ অর্থাৎ ডিফো, রিচার্ডসন, ফিল্ডিং-এর সময়

থেকে এর যে যাত্রা শুরু হয়েছে formal realism বা রূপগত বাস্তবতার সরণি বেয়ে, পরবর্তীকালে ঐতিহাসিক উপন্যাসের তথ্য সমাবেশে বিপুলতা এবং মনস্তাত্ত্বিক ও চেতনা প্রবাহমূলক উপন্যাসের সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর মনোবিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে তার যাত্রা অব্যাহতভাবে গতিশীল। অবশ্যই স্বীকার করতে হবে পরবর্তী সময়ে realism-এর খোলবদল বা ভাববদল ঘটেছে। ব্যক্তির চিন্তাভাবনার অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ, ব্যক্তিসত্তার বিচিত্র ও বহুমুখী প্রকাশ, জটিল অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং পরস্পর বিমুখী আকর্ষণের ভেতর থেকে ব্যক্তিত্বের স্বচ্ছ উদ্ঘাটন ও উন্মোচন আজকের উপন্যাসের মুখ্য বিষয়। একথা ইংরেজি বা আধুনিক ইউরোপীয় অন্য দেশের উপন্যাস সম্বন্ধে যেমন, বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে সমান সত্য। পার্থক্য এই যে, ইংরেজি পাশ্চাত্য উপন্যাস যেভাবে বিবর্তিত হয়েছে, বাংলা উপন্যাসের ধারা ঠিক সেভাবে বিবর্তিত হয়নি। ঐতিহ্যে যতই আমরা আস্থা পোষণ করিনা কেন, একথা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই যে, অনাধুনিক বাংলা সাহিত্যের কোনও শাখাতেই (এমনকি প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের কোনো রূপের মধ্যেও) উপন্যাসের পূর্বসূত্র দৃষ্ট হতে পারেনা। (ঐতিহ্যবাদী সমালোচকগণ নিশ্চিতই এ মতের বিরোধিতা করবেন।) কারণ উনিশ শতকের আধুনিকতার পরিমণ্ডলে নানাবিধ ঘটনা-পরম্পরা এর আবির্ভাবকে সম্ভব ও ত্বরান্বিত করেছে।

বাংলাদেশে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পর ইংরেজদের বাংলা ভাষা শিক্ষা এবং ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রতিষ্ঠা। তার পরই এদেশে ইংরেজি শিক্ষার সূত্রপাত। এবং বলা বাহুল্য, এরই মধ্য দিয়ে ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালির ইংরেজি সাহিত্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটে। এই পরিচয়ের ফলশ্রুতি হিসেবেই ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাব আমাদের সাহিত্যে পড়েছে অনেকখানি। বাংলা উপন্যাসের ঐতিহাসিক ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ইংরেজি সাহিত্য-প্রভাবে আমাদের দেশে উদ্ভূত নোতুন সাহিত্যের মধ্যে উপন্যাসকেই 'প্রধানতম' বলেছেন। তিনি বলেছেন, উপন্যাসের মতো কোনো বস্তু আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে ছিলোনা। শুধু আমাদের দেশই নয়, পৃথিবীর কোনো দেশেই প্রাচীন সাহিত্যে উপন্যাস ছিলোনা। তিনি অবশ্য একথা স্বীকার করেছেন যে, এদেশের প্রাচীন সাহিত্যে প্রচ্ছন্নভাবে[১৩] হলেও উপন্যাসের 'প্রথম অঙ্কুর ও আদি লক্ষণগুলি' আবিষ্কার করা যায়। ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এরূপ পরস্পর-বিরোধী-~~[illegible]~~-মন্তব্যের কারণ কী? জনৈক সমালোচকের মতে, "উপন্যাসের উদ্ভব প্রসঙ্গে বিদগ্ধ সমালোচকের প্রায়-পরস্পর-বিরোধী বিভিন্ন মন্তব্যের মূলে তাঁর ঐতিহ্য-

ঐতিহ্যপ্রীতিই কাজ করেছে।"[১৪]

যে কোনো বস্তু সৃষ্টিকে অতীতের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন করে দেখা চলেনা – এ বিশ্বাসকে তাঁর মতো অনেক সমালোচকই আঁকড়ে ধরে রাখতে চান। কিন্তু তাঁদের ~~[illegible]~~ বক্তব্যে যুক্তিনিষ্ঠ বিশ্লেষণের পরিবর্তে আবেগ-বাহুল্যই লক্ষ করি। বাংলা উপন্যাসের উদ্ভব আকস্মিক ঘটনা না হলেও প্রাচীন সাহিত্যের সঙ্গে ধারাবাহিকতা সূত্রে তার যথার্থ উত্তরাধিকার বহন করে তা আবির্ভূত হয়নি।[১৫] বস্তুত, উপন্যাস তো নয়ই, উপন্যাসের ~~[illegible]~~ অনুরূপ কোনো বস্তুই আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে ছিলোনা। উপন্যাসকে উদ্ভবকালে কিছু আবশ্যিক শর্ত(দ্রঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য – উপন্যাসের কথা, পৃ—৫-৬) পূরণ করতে হয়েছে – যে শর্তগুলি উনিশ শতকের পূর্বে আমাদের জীবনে বা সাহিত্যে ছিলোনা। উনিশ শতকের প্রারম্ভ পর্যন্ত উপন্যাস রচনার কোনও ট্রাডিশন এদেশে ছিলোনা। বরং বলা যায়, ইংরেজি সাহিত্যের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসে বাঙালি লেখকদের মধ্যে সঞ্চারিত হল এক নোতুন চেতনা ও রসবোধ বা জীবন পিপাসা এবং তাঁদের দ্বারাই গড়ে উঠল বাংলা উপন্যাসের প্রকৃত ধারা যা পরবর্তীকালে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষায় রূপান্তরিত হতে হতে বর্তমান পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। প্রকৃতপক্ষে বাংলা উপন্যাসের ট্রাডিশন বঙ্কিমচন্দ্রই তৈরী করেছেন। তাঁরই হাত ধরে বাংলা উপন্যাস কালের [illegible] ধরে শৈশব থেকে কৈশোর অতিক্রম করে পূর্ণ ~~[illegible]~~ যৌবন বেশ লাভ করলো।

উনিশ শতকের শুরুতে আমাদের আখ্যান রচনার ধারা(প্রকৃত অর্থে উপন্যাসের রচনা শুরু হয়েছে শতকের দ্বিতীয়ার্ধে) বাস্তবতার ~~[illegible]~~ পথ ধরেই চলছিল কিন্তু সে বাস্তবতা আর সাম্প্রতিক কালের ~~[illegible]~~ বাস্তবতার মধ্যে ব্যবধান বিস্তর। প্রথম দিকের উপন্যাসের(কিংবা বলা যায় – উপন্যাসকল্প কথা সাহিত্যের) অবলম্বন ছিলো বহির্বাস্তবতা বা outer-realism; তখন কাহিনী ছিলো কিন্তু চরিত্র ছিলোনা। এখন তা রূপান্তরিত হয়েছে অন্তর্বাস্তবতা বা inner realism – এ। যে দেশ-কাল পটভূমিতে ডিফো, রিচার্ডসন, ফিলডিং প্রভৃতি লেখকদের বাস্তবধর্মী উপন্যাস রচনা শুরু হয়েছিল, আমাদের দেশে তেমন অবস্থা কোনওকালে আসেনি। ইংল্যান্ডের ১৮শ শতাব্দীর বিশিষ্ট পরিবেশ ও জীবনধারা তাঁদের সাহিত্যে অবিকল প্রতিবিম্বিত হয়েছে। কারণ তৎকালীন সমাজ-জীবন ও মনসৃষ্টি ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবোধ আপন স্বাক্ষর

এঁকে দিয়েছিল তাঁদের রচিত উপন্যাসে। নবজাগৃতি ও ধর্মসংস্কার আন্দোলনের ফলে পুরনো ধ্যানধারণা, আদর্শ ও মূল্যবোধের পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী রূপে দেখা দিয়েছিল। ডিফো-র ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য-চেতনা, রিচার্ডসনের নারী জাগরণের তত্ত্বপূর্ণ সম্ভাবনাময় বাণী সে যুগেরই বিশিষ্ট ভাবনার ফলশ্রুতি। তাঁদের রচনার মধ্যে সমকালীন বাস্তব পরিবেশ যেভাবে দানা বেঁধে ওঠার পর ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিকদের আবির্ভাব লক্ষ্য করি, আমাদের সাহিত্যে সেরূপ অবস্থা আদৌ দেখা যায়নি। অবস্থাটা কিরূপ ছিল দেখা যাক।

প্রথমদিকের তৎকালীন সমাজ-পরিবারভিত্তিক আখ্যানমূলক রচনার ধারা আগে থেকে শুরু হলেও নির্দিষ্ট আকার প্রাপ্ত হবার পূর্বেই কাহিনীমূলক রচনার ধারা (ভূদেব, বঙ্কিম প্রভৃতির) সেখানে জাঁকিয়ে বসে। ইংরেজিতে রোমান্সের যে প্রতিশব্দ সে শ্রেণীর বাংলা শব্দের প্রতিশব্দ অনুরূপ তাকেই বলা যায় কাহিনী। এ শ্রেণীর গল্প(কাহিনী) অতীতের ঘটনার আশ্রয় ছাড়া বেড়ে উঠতে পারেনা। সে অতীত আবার সীমাহীন, তারিখ-স্থাননির্দিষ্ট অতীতও হতে পারে। এ গল্প দেশকাল নির্ভর নয় - অন্তত মূলে তো নয়ই, কালের আভাস থাকলেও তাতে না আছে বাস্তবতা, না আছে চরিত্রগুলির নির্দিষ্ট কালপরিধিতে চলাফেরা। সেখানে চরিত্রেরা অপরিবর্তনীয় ও সুদূর কল্পনালোকের বাসিন্দা। কিন্তু আখ্যান বাস্তবতা নির্ভর। নির্দিষ্ট দেশকালে ও পরিবেশের চৌহদ্দিতে তা পরিবদ্ধ। ঔপন্যাসিকের বাস্তব অভিজ্ঞতার স্বাক্ষরই তার মধ্যে লক্ষিত হয়। প্রথমযুগের যে সকল আখ্যানমূলক রচনার মধ্যে উপন্যাসের পূর্বসূত্র বা অনেকের মতে, আদি উপন্যাসের লক্ষণ দেখা গেছে সেগুলি হলো বাবুর উপাখ্যান, নববাবুবিলাস, নববিবিবিলাস, কলিকাতা কমলালয়, ফুলমণি ও করুণার বিবরণ(যদিও মৌলিক রচনা নয়), আলালের ঘরের দুলাল, চন্দ্রমুখীর উপাখ্যান, সুশীলার উপাখ্যান ইত্যাদি এবং কাহিনীমূলক রচনার মধ্যে ছিলো ভূদেবের ঐতিহাসিক উপন্যাসের অন্তর্গত অঙ্গুরীয় বিনিময়। তাছাড়া ছিলো আরও আগেকার বিজয়বসন্ত, গোলেবকাওলি প্রভৃতি রম্য আখ্যায়িকা।

ইংরেজি সাহিত্যের ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ যুগে বিশেষ বিশেষ প্রবণতার (যেমন Romanticism, Classicism প্রভৃতি) প্রাধান্য লক্ষ্য করা গেছে। আমাদের দেশের সাহিত্যে যুগবিশেষে বিশেষ প্রবণতার নিরঙ্কুশ প্রাধান্য ঠিক সেভাবে দেখা যায়নি।[১৬] একই সঙ্গে নানাজাতের, নানাপ্রবণতার সহাবস্থান ও প্রকাশ আমাদের

নজরে পড়ে। কারণ, উনিশ শতকের প্রথমার্ধে (আঠারো শতকের শেষার্ধ থেকেই) আমাদের সমাজ ছিলো নানা টানাপোড়েনে প্রচণ্ডভাবে সংক্ষুব্ধ, ব্যক্তিমানসের স্ফুরণ তো ঘটেইনি বরং শামুকের খোলের মতো নিজেকে গুটিয়ে নেবার প্রাণপণ চেষ্টার ত্রুটি ছিলোনা। ইংরেজরা যখন ভৌগোলিক আবিষ্কার ও শিল্পবিপ্লবের ফলে দেশের সীমানা ছাড়িয়ে নিজেদেরকে ব্যাপ্ত করে দিয়েছে নানা দিকে, আমরা তখন তো নয়ই, এমনকি সেই দিনের পরিস্থিতি উদ্ভূত না হওয়ায় এখনও বহির্জগতে সেভাবে প্রসারণ বিস্তারের কথা ভাবিনা। তাছাড়া, সমাজভাবনার ঊর্ধ্বে ব্যক্তিভাবনা উঠতে পারেনি যতোদিন না পাশ্চাত্য সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের পরিচয় এবং ওতপ্রোত সংযোগ ঘটেছে। দেশকালের সুনির্দিষ্ট ধারণা এবং তারই পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তিমানুষ অস্তিত্ব সম্পর্কে চেতনা না হওয়া পর্যন্ত ব্যক্তি সমাজের অংশবিশেষ; তার নিজস্ব ও একান্ত ব্যক্তিগত চাহিদা ও মানসিক মুক্তি-প্রবণতা তখন অনুদ্ভূত হয় এবং উপন্যাসের যথার্থ আবির্ভাব বিলম্বিত হয়।

সুতরাং পরিস্থিতির ভিন্নতার ফলেই ইংরেজি সাহিত্যের অষ্টাদশ শতকের উপন্যাসের বহির্বাস্তবতা এমন সহজ ও সুস্পষ্ট, আর উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের আখ্যানমূলক রচনা প্রসারে অস্পষ্টতা, শিথিলবন্ধতা ও অপূর্ণতা। একদিকে অন্তর্বিরোধ, অন্যদিকে ব্যক্তিসত্তার সমাজসত্তার নিকট আত্মসমর্পণ ও ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির বিলম্বিত প্রসার আমাদের সাহিত্যে উপন্যাস সৃষ্টির বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এ সম্পর্কে জনৈক সমালোচকের বিশ্লেষণ প্রণিধানযোগ্য। তাঁর মতে, "ইংরেজী সাহিত্যে উপন্যাস রচনা শুরু হয়েছিল শিল্পবিপ্লবের ফলে প্রাচীন অর্থনীতি ভেঙে গিয়ে যখন নতুন যুগ এল, যান্ত্রিক উৎপাদনের প্রাধান্য হল। আর ঐতিহাসিক পরিবেশ ছিল এশিয়া-আফ্রিকা-আমেরিকায় য়ুরোপীয়দের উপনিবেশ বিস্তার। বাংলা দেশ ও বাঙালি সমাজ যখন ইংরেজদের সঙ্গে সম্পর্কে এসেছে তখন ইংরেজ-সমাজ সব-সবচেয়ে শক্তিশালী, সবচেয়ে আত্মসম্পূর্ণা, সাম্রাজ্যবাদী শক্তির যুগে; এক'শ বছর একরকমই কেটেছে। ইংরেজদের সঙ্গে সম্বন্ধের ইতিহাসের এই প্রথম একশ' বছর আমাদের দেশে একটা মধ্যবিত্ত শ্রেণী ধীরে ধীরে জন্মেছে; সেই শ্রেণীর একটা অংশ ধীরে ধীরে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উঠেছে ও সেই অংশ সমাজের এলিট অংশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। ইংরেজের সঙ্গে সম্বন্ধের ইতিহাসের প্রথম একশ বছরের

পর প্রায় পুরো পঞ্চাশ বছর এই এলিটদের মধ্যে ইংরেজের আত্মিক সহযোগিতা ছিল । এই আত্মিক সহযোগিতার ফলেই পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের সঙ্গে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে । সেই সম্পর্কের সূত্রেই নতুন কবিতা, নাটক, উপন্যাস আমাদের সাহিত্যে এল ১৮৫০ সালের পর থেকে ।”[১৭]

উপন্যাসের উদ্ভবের মূলে যথার্থ কার্যকরী শক্তি- বাস্তব সমাজ-প্রতিবেশ ও ব্যক্তিজীবনের কথা প্রসঙ্গে দেখলাম উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের পূর্বে উপন্যাসের মূলনীতি সম্পর্কে সচেতনতা বা তার বাস্তব প্রতিফলন ঘটেনি । যে 'রোমান্সের আবরণ' বিচরণ করতে করতে বঙ্কিমচন্দ্র বাস্তবজীবনভিত্তিক উপন্যাস-রচনায় মনোনিবেশ করলেন এবং যে বাংলা মুসলমানের মধ্যে মধ্যযুগপরবর্তী হয়ে অনেকখানি অনূদিত সাহিত্যধারায় হয়ে উর্দু, আখ্যান কিংবা কাহিনী রচনায় সেই 'মনকে পাকানোর মুখ' রচয়িতাদের কাছ কতখানি অবদান ? বলা যায়, সমকালীন বাস্তবতা দ্বারা আখ্যান রচয়িতারা প্রভাবিত ~~হয়েছিলেন~~ হয়েছিলেন কিন্তু যথার্থ সৃজনী প্রতিভা না থাকায় তাঁরা (বিশেষ করে আখ্যান রচয়িতারা) উপন্যাস (সঠিক অর্থে) সৃষ্টি করতে পারেননি এবং বাংলা উপন্যাসের ধারায় কোনও নতুন মাত্রা সংযোজন করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন । উপন্যাসের অত্যাবশ্যক পূর্বশর্ত হলো ব্যক্তিত্বের মর্যাদা । আধ্যাত্মিকতামূলক ভাবাবৃত্তি দ্বারা চালিত হয়ে এঁদের অধিকাংশ লেখক এরূপ সত্তা রচনায় কোথাও তীব্র আর্তিকে সমর্থন করলেন । অবশ্য তাঁদের রচনায় তাঁরা একপ্রকার বাস্তবিকতার আস্বাদ এনে দিতে পেরেছিলেন কিন্তু তার ভেতর থেকে জিজ্ঞাসু মূল্যবোধ ও স্থায়ী রস নিষ্কাশন করতে পারেননি । অর্থাৎ, এক কথায় বলতে পারি, উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের পূর্বে বাংলা উপন্যাস রচনার কোনো ঐতিহ্য সৃষ্টি হয়নি এবং ~~[illegible]~~ এ যুগের কথাসাহিত্যিক (গদ্য আখ্যান) রচয়িতাগণ বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির অভাবে উপন্যাস রচনা করতে ব্যর্থ হয়েছেন ।

তাহলে ঐ সকল লেখকদের সাহিত্যরচনার গুরুত্ব কী ? গুরুত্ব অবশ্যই আছে । যথার্থ উপন্যাস রচনায় ব্যর্থ হলেও তাঁদের মৌলিক আখ্যান রচনার প্রয়াস পরোক্ষ হলেও উপন্যাসের আবির্ভাবকে ত্বরান্বিত করেছে ভিন্নরূপে । সমকালীন বাস্তবতার যে ধারাবাহিক কিংবা খণ্ডচিত্র তাঁদের রচনায় প্রকাশিত তা বাংলাদেশের বিশেষ অঞ্চলের বিশেষ জীবনধারা ও সমাজ-জীবনের বাস্তব পরিচয় বহন করে । আমাদের কাছে
^ও মর্যাদা স্বীকৃত ও অবশ্যম্ভাবী । তাঁদের কাহিনীতে দুঃখবোধ স্পষ্ট
এর ঐতিহাসিক মূল্য ^ ছিলনা সত্য, কিন্তু তাঁরাই প্রথম নির্দিষ্ট দেশকালের গণ্ডীতে

অবশ্য মানুষকে নিয়ে আমাদের প্রাথমিক কৌতূহল চরিতার্থ করেছেন। বঙ্কিম-পূর্ব কালকে তাই বলা যায় - উপন্যাস রচনার শিক্ষানবিশীর কাল। রোমাঞ্চকর শিহরণ জাগানো কথা নয়, রাজপুত্র-রাজকন্যা-পরীর গল্পও নয় - প্রত্যক্ষদৃষ্ট পাত্র-পাত্রী সমন্বিত বাস্তবগত অভিজ্ঞতা-নির্ভর কাহিনী রচনার সূত্রপাত হয় এঁদের হাতেই। শুধু তাই নয়, যে 'নবজাগ্রত মধ্যবিত্তরা' উপন্যাসের পাঠক-সৃষ্টির প্রাথমিক পর্ব, সেটাও এঁরা মিটিয়েছেন। কলকাতাকেন্দ্রিক দু'ধরণের নাগরিক ও তাঁদের সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্ব আছে বলেই প্রথম যুগের উপন্যাসোপম আখ্যায়িকাগুলির জন্ম। লেখকেরাও সংরক্ষণশীল এবং প্রগতিবাদী - দু'দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছিলেন। “উনবিংশ শতাব্দীর কলকাতা এবং মফস্বলের জীবনের বিন্যাস, যে বিন্যাসের উপর নানা আলোচনায় খুঁটিনাটি সমাজতাত্ত্বিকের কাছে অবশ্যই কৌতূহলোদ্দীপক, কিন্তু সাহিত্য-বিচারের কাছেও সে সমস্যার তীব্র টানাপোড়েন কম চিত্তাকর্ষক নয়। কেননা এই টানাপোড়েনের মধ্যে আত্মপ্রকাশী জন্মলাভ করেছে বাংলা উপন্যাস। ..... কলকাতা এবং কলকাতার সন্নিকটবর্তী মফস্বলকে অবলম্বন করে তখন জীবনের দুইধারা স্পষ্টই স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। একদিকে ছিল কলকাতামুখী [illegible] প্রভৃতি দর্শনবাদীদের ও নব্য বঙ্গোদ্ভবশ্রেণী - আর সমস্ত বাবুয়ানি - বিলাসব্যভিচারাদি সমেত - আর একদিকে ছিল দুর্বল এবং প্রতিক্রিয়াশীল প্রাচীন পুঁথি - অনুগামী সংস্কৃত বিদ্যানুরাগী সমাজ। যুরোপের বিবরণে, নববাবু বিলাসে এবং বঙ্কিমের লোকরহস্যের বর্ণনায় কিছু দ্বেষ আতিশয্যটুকু বাদ দিলে এই দুই ধারারই প্রতিচ্ছবি পাওয়া যাবে।”[১৬] দেখা যাচ্ছে, আখ্যায়িকা গ্রন্থগুলিতেও কিছু দ্বেষ আবরণের অন্তরালে সমকালের মানুষ ও জীবনভাবনার ছবি আছে। এক্ষেত্রেও এ সকল লেখকদের রচনার একেবারেই গুরুত্ব নেই, এমন কথা বলা যাবেনা।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী' ঐতিহাসিক উপন্যাসের(বা ইতিহাসাশ্রয়ী রোমান্সের) যে ধারার সূচনা করল তার পূর্বসূত্র পাওয়া যায় ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'ঐতিহাসিক উপন্যাস'-এ। বঙ্কিমচন্দ্র প্যারীচাঁদ, কালীপ্রসন্ন প্রভৃতি লেখকের পথ না ধরে ভূদেবের পথ অনুসরণ করেছিলেন। টেকচাঁদ বা প্রমথনাথ শর্মার লেখা বাঙালির নিকট তাৎপর্যহীন 'মুখরোচক চাটনি' বলে প্রতিভাত হয়েছিল। প্যারীচাঁদের লেখার প্রশংসা করলেও বঙ্কিম তাঁকে অনুসরণ করেননি। সমকালের বাঙালি মানসিকতায়

উদ্ভূত হয়ে বঙ্কিম এঁদের পথ পরিহার করে ভূদেবের পথই অনুসরণ করেছিলেন। অন্য কারণও ছিল। এ প্রসঙ্গে ডঃ সুধাকর চট্টোপাধ্যায়-এর বিশ্লেষণ সম্পূর্ণ সমর্থনযোগ্য। তিনি বলেছেন - "উপন্যাস রচনার ট্র্যাডিশন দেশে তখনও দেখা দেয়নি। .... উপন্যাসিক সম্ভাবনার জন্য 'আলালের ঘরের দুলাল'কে কিছু লোকে বাড়াবাড়ি করেনি। দেশের লোক রোমান্স-জাতীয় লেখা পড়তে ভালোবাসে।"[11]
বঙ্কিম প্রসঙ্গে একথা বলা হলেও শুধু বঙ্কিম নয়, রমেশচন্দ্র দত্ত, প্রতাপচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ লেখকবৃন্দও এই একই পথে পদচারণা করেছিলেন। কিন্তু বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করা গেল - ভূদেব প্রবর্তিত ধারা উত্তরসূরীদের রচনায় অব্যাহত থাকলেও কালক্রমে সে ধারা ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হতে থাকে। কারণ শুধুই কৌতূহল পাঠকে আনন্দের সন্ধান দিতে পারেনা। প্রশ্ন-~~জমাতে~~ জাগাতে না পারলে উপন্যাসের কাহিনী ব্যর্থ হয়। অথচ বাস্তব সামাজিক ও পারিবারিক জীবনানুগ কথা-কাহিনীর ধারা, যাদের সামাজিক-পারিবারিক উপন্যাস নামে চিহ্নিত করা হয়, ক্রমেই ব্যাপক ও গভীর হতে থাকে। সুতরাং বঙ্কিমপূর্ব লেখকদের গুরুত্বকে স্বীকার করে নেওয়াই উচিত।

বলা বাহুল্য, বাস্তবমুখী আখ্যান রচনার এই ধারার উৎস সন্ধানে যেতে হলে পদক্ষেপ করতে হবে ভূদেবের অনেকটাও পূর্বে। বস্তুত ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দের 'সমাচার দর্পণ' - এর পৃষ্ঠায় অজ্ঞাত পরিচয় লেখকের 'বাবুর উপাখ্যান'-এর মধ্যেই আধুনিকালিখিত কথা সাহিত্য বিশেষ করে বাস্তবানুগ উপন্যাস সাহিত্যের কিছু লক্ষণ বীজাকারে উপ্ত হয়। এই উপাখ্যানের মধ্যে উপন্যাসের ক্ষীণ পূর্বাভাস এ ধরণের পরবর্তী আখ্যান 'নববাবু বিলাস'-এর মাধ্যমে কিছুটা প্রবল, ব্যাপক ও নিকটবর্তী হয়। সমকালীন জীবনযাত্রা-নির্ভর ব্যঙ্গাত্মক রচনায় এই ধারা অব্যাহত থাকা সত্ত্বেও (বর্ণনা ও আঙ্গিকে পরিণত ও সুসমঞ্জস হলেও রসের নিষ্পত্তি ব্যাপারে) হয়ে বঙ্কিমের 'মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত' পর্যন্ত প্রসারিত। অন্যদিকে যথার্থ বাস্তবমুখী ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা-ভিত্তিক সামাজিক-পারিবারিক কথা-কাহিনী নোতুন নোতুন মাত্রাযুক্ত হয়ে নব কলেবর ধারণ করে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত প্রসারিত। ব্যক্তি-ভাবনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ, দুরূহ-জটিল মনস্তত্ত্বের সূক্ষ্ম রূপায়ণ বঙ্কিমপূর্ব যুগে এমনকি বঙ্কিম-যুগেও আশা করা যায়না। অথচ সাম্প্রতিক কালে এটা উপন্যাসের অন্যতম অবশ্য পালনীয় শর্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে। সে যাই হোক, বঙ্কিমপূর্ব লেখকদের রচনায়

এ বৈশিষ্ট্যগুলো না থাকলেও তাঁদের দূরদর্শিতা ও কালচেতনাকে কোনোক্রমেই উপেক্ষা করা যায়না ।

অনেক ঐতিহাসিক-সমালোচক 'নববাবুবিলাস' -রচয়িতা ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়(ওরফে প্রমথনাথ শর্মা)কেই বাবুর উপাখ্যানের লেখকরূপে চিহ্নিত করতে চান । 'বাবুর উপাখ্যান'-এর কাহিনীতে কোলকাতার এক ধনাঢ্য দেওয়ান রাজচন্দ্রবর্তীর পুত্র তিলকচন্দ্রবাবুর সংক্ষিপ্ত জীবন কথা বর্ণিত । প্রচুর ঐশ্বর্যের মালিকের একমাত্র পুত্র হিসাবে বৈষয়িক-সম্বন্ধ, বুদ্ধিহীন আমোদ-প্রমোদে মত্ত থাকেন, পিতার মৃত্যুর পর হিসাবে পৈতৃক অর্থের অপব্যয় করেন এবং পৈতৃক মহলে দিয়ে দেবদর্শন হিসাবে বিভূষিত হন তার পরিচয় রয়েছে এ কাহিনীতে । চিত্রণী ও রচনায় কাহিনী দুর্বল ও অস্পষ্টতাপূর্ণ । চরিত্র-চিত্রণের কোনও প্রয়াসই নেই । গল্পে ধারাবাহিকতা মোটামুটি রক্ষিত হলেও কার্যকারণ সূত্রের প্রয়োগ নেই । সময়ের কৌতুক বৈশিষ্ট্য আছে বা অদ্ভুত যোগাযোগ । দেওয়ান রাজচন্দ্রবর্তীর পুত্রের জন্ম হল । নাম রাখা হল তিলকচন্দ্রবাবু । তাঁর জন্মোৎসব বর্ণনার পরে উল্লেখ করা হয়েছে তার মধুর স্বর শোনা যেতো । "এহেতু বাবুর তোতুল কর্ণ কুহরে প্রবেশ হইল মুক্তি শিশুকালের জ্ঞান যথেষ্ট ।"[১৩] সমসাময়িক ব্যক্তি ও সমাজ এখানে আছে, কিন্তু কালপ্রবাহে জন্মের যে সুস্পষ্ট রূপ উপন্যাসে থাকে তা এখানে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত ।

প্রথম যুগের কথা-কাহিনীর মূলে বেশ সক্রিয় রয়েছে লেখকের suspense বা অনিশ্চয়তার ভাব সৃষ্টি এবং পাঠকচিত্তের curiosity বা কৌতূহল নিবারণ । ইংরেজি শিক্ষা এদেশে প্রচলিত হবার পূর্বেও বিভিন্ন বাংলা ভাষা - কবিতায় সমকালীন রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার বিবরণ অলভ্য নয় । কিন্তু সে সকল বিবরণ বৈচিত্র্যহীন । দেশে রাজনৈতিক পটপরিবর্তন যেরূপ দ্রুত ও সুদূরপ্রসারী হয়েছে, বাঙালি সমাজে সেরূপ পরিবর্তন বা গতিশীলতা সৃষ্টি হয়না । স্থিতিশীল সমাজ-কাঠামো ও গণ-আচরণের ধারাবাহিকতা বৈচিত্র্য সৃষ্টির পরিপন্থী । ভিন্ন বাতাস ভারতবর্ষে সমাজদেহে আঘাত হানাতে যে দুস্পূর উৎপত্তি হল তাইই জাতীয় কল্পনার উন্মেষ ঘটায় । কিন্তু লক্ষণীয়, নানা ভাব-সংঘাতের সৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও প্রথম যুগের লেখকগণ তাঁদের রচনায় পাত্র-পাত্রীর ব্যক্তিস্বরূপ বা ব্যক্তিত্বের সামাজিক

ও নৈতিক সংকটজনিত মানসিক দুর্দ্বন্দ্ব প্রতিফলন ঘটাতে সক্ষম হননি । তাঁদের রচনায় সমকাল প্রাধান্য বিস্তার করলেও সম্ভাব্য ভবিষ্যতের আলেখ্য ফুটে ওঠেনি । এমনো তাঁদের রচনা যতোটা সংবাদ ততোটা সাহিত্য হয়নি ।

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নববাবুবিলাস' কে 'বাবুর উপাখ্যান'-এর কিছুটা পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত রূপ হিসেবে গণ্য করা চলে । সমকালীন কোলকাতার সামাজিক পটভূমিতেই রচিত হয়েছে এ কাহিনী । পূর্ববর্তী কাহিনীর ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতা থেকে এ কাহিনীও মুক্ত নয় । এতে আছে, হঠাৎ গজিয়ে ওঠা পরগাছা নববাবুর আড়ম্বরময় জীবনযাত্রার কাল্পনিক অতিরঞ্জিত বর্ণনা । ইংরেজী শিক্ষা সুপ্রতিষ্ঠিত
ও কার্যকলাপ এতে স্থান পেয়েছে । বর্ণনায় ধারাবাহিকতা রক্ষিত
হবার আগেকার কোলকাতার হঠাৎ বড়োলোকদের জীবন হলেও নববাবু বা তার স্ত্রীর অন্তর্জীবনের কথা আদৌ ফুটিয়ে তোলা হয়নি । নববাবু ব্যক্তির প্রতীক, তার ব্যক্তি-স্বরূপ উন্মোচনের কোনও প্রয়াসই নেই । বিশেষ কোনো 'নববাবুর' চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও কার্যকারণ সূত্রের ন্যায়সঙ্গত শৃঙ্খলার ভিত্তিতে তার পরিবর্তনের মূল্যায়ন প্রতিফলিত না হয়ে সাধারণভাবে 'বাবু' সমাজের নির্দিষ্ট চারিত্রিক বিশেষত্ব ও নীতিকথামূলক পরিণতি অর্থাৎ প্রধান চরিত্রের হঠাৎ অনৌচিত্য আকস্মিক রূপান্তর এতে প্রদর্শিত হয়েছে । সামগ্রিক বিচারে, সমকালীন সমাজবিশেষের বাস্তব সমাজচিত্রের নিছক সংবাদমূলক বিবরণ ছাড়া এর অন্য কোনও গুরুত্ব আছে বলে মনে হয়না । তাহলে, পরবর্তী সময়ে উপন্যাস রচনার যে ট্রাডিশন গড়ে উঠল তাতে 'নববাবুবিলাস'-এর স্থান কোথায় ?

বিশেষভাবে স্মর্তব্য যে, 'নববাবুবিলাস' ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাভিত্তিক এমন আখ্যান 'যা নির্দিষ্ট স্থান-কাল-পাত্রের পরিচয়বহ ।' সাধারণ কাল বিচারে ঘটনা-কালের উল্লেখ না থাকলেও ঐতিহাসিকের দৃষ্টিকোণ থেকে এ গ্রন্থের গুরুত্ব অস্বীকার করা যায়না । চারটি ছোট ছোট খণ্ডে 'নববাবুবিলাস' বিভক্ত ; ঘটনা সংঘটনের কালব্যাপ্তির কোনো সুস্পষ্ট আভাস এতে নেই । 'অঙ্কুর খণ্ডে' নববাবুর বাল্যকাল ও শিক্ষার বৃত্তান্ত, 'পল্লব খণ্ডে' বাবুর বেশভূষা, যানবাহন, বন্ধুবান্ধব-মোসাহেব ইত্যাদির বর্ণনা এবং নানাপ্রকার নীতি-উপদেশ, 'কুসুম খণ্ডে' বাবুর ফুলবাবুতে রূপান্তর এবং প্রমোদে আকণ্ঠ নিমজ্জনের কাহিনী এবং সর্বশেষ 'ফলখণ্ডে' বাবুর করুণ পরিণাম বর্ণিত হয়েছে । বস্তুত, এগুলো কলকাতায় নববাবুদের প্রতিভূ জনৈক নববাবুর জীবনী হয়ে দাঁড়িয়েছে । ধারাবাহিকতা থাকলেও উপন্যাসের সামগ্রিকতা

এতে নেই। বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতির এক সন্ধিলগ্নের বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠী ব্যক্তিজীবন ও চিন্তার প্রকাশ এতে ঘটেছে সত্য, তবে উপন্যাসের উপকরণের মূল কিছুটা গতিবেগও সঞ্চার করেছে।

১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে(১৮৩২ ?) গদ্যে-পদ্যে রচিত তাঁর 'নববাবুবিলাস' গ্রন্থে নববাবুদের বিলাসবহুল জীবনযাপন ও করুণ পরিণতির কথাই সবিস্তারে বর্ণিত। তাঁর 'কলিকাতা কমলালয়'(১৮২৩) ও 'দূতীবিলাস' ঐ একই ধরণের রচনা। এগুলিকে একই সঙ্গে সামাজিক নক্সা(social sketch) ও উপন্যাসের পূর্বসূরী বলা যেতে পারে। চরিত্রের সুস্পষ্ট রূপ কিংবা তার কাহিনীচিত বিকাশ এ সকল গ্রন্থে অনুপস্থিত থাকলেও ভবানীচরণের সাহিত্যকৃতির মূল্যায়ন প্রসঙ্গে অজীতেন্দু মিত্রের মন্তব্যের কথাটা উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছেন, - "একমাত্র ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নক্সাগুলিতে সমকালীন জীবনের প্রতিচ্ছায়া আছে। তাঁর কথা-কাহিনীর মর্মমূলে রূপলাভ করেছে বাংলাদেশের জনগত জীবন চেতনা। সংস্কৃত সাহিত্যের অনুকরণ নয়, ইতিহাসের অনুবর্তী শিক্ষাও নয়, দেশের সমাজ জনজীবন, প্রকৃতিতে তাঁর নিবিড় নিবেশ। সত্য বটে, তাঁর লেখায় শ্লেষ আছে, সৌষ্ঠব নেই; নক্সা আছে, ছবি নেই - তবু তা কথাসাহিত্যেরই এবং তাতে গল্পের কথাই ফুটে উঠেছে।"[১১]

এর দীর্ঘকাল পরে ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় হানা ক্যাথেরীন মুলেন্স প্রণীত 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ'। আখ্যানমূলক রচনার ধারায় এত স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল গদ্যভাষা এর আগে আর বাংলা সাহিত্যে দেখা যায়নি। এ বইটির মূল্যায়ন করতে গিয়ে সমালোচকেরা বিভিন্ন বিপরীতধর্মী মত ব্যক্ত করেছেন।[১২] তবে 'ঔপন্যাসিকের মানসদৃষ্টি, নিখুঁত জীবনঘটিত অভিজ্ঞতার বিন্যাস ও উপন্যাসোচিত সম্ভাব্যতা' (সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায়) তিনটির একটি শর্তও এ পুস্তকে নেই। মোট দশটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত(১৪৪ পৃ., নূতন সংস্করণ, ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ) এ বইটির কাহিনীতে উপন্যাসসুলভ বিস্তার ও সুষমা প্রথম পাওয়া গেল এবং একমাত্র করুণার চারিত্রিক বিবর্তন(বা ধারাবাহিক রূপান্তর) ছাড়া সর্বত্রই গতিশীলতার পরিবর্তে নিশ্চলতা দৃষ্ট হয়। লেখিকা বিশেষ উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে এ গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তখনও সকল রচনার(বিশেষত গদ্য রচনার) সেক্ষেত্রেই উদ্দেশ্যমূলকতা

থাকতে পারে কিন্তু তা সকল বহিরাবরণ ছিন্ন করে' একটি আকার ধারণ করলে রচনার মূলধর্ম ক্ষুন্ন হয়।

অবশ্যই মনে রাখা প্রয়োজন, শুধুমাত্র সমকাল-বিধৃত সমাজ ও জীবনেরই রূপায়ণমাত্র উপন্যাস আখ্যা পেতে পারেনা। 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ'-এর সমাজ আবার সঙ্কীর্ণ ও গণ্ডীবদ্ধ। বৃহত্তর জীবনের ছবি বা তার কোনো ~~ইঙ্গিত~~ ইঙ্গিত এখানে নেই। তাছাড়া, বিভিন্ন ঘটনা ও চরিত্র অনেকটাই অসংলগ্ন ও শিথিলবদ্ধ মনে হয়। কারণ, লেখিকা নিজেও কাহিনীর অন্যতম চরিত্র এবং বলতে গেলে তিনিই ঘটনার নিয়ন্তা; ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তি বা সমাজের দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক ঘটনার গতি নিয়ন্ত্রণে মুখ্য ভূমিকা নেয়নি। তিনপর্বী, বিভিন্ন কাহিনীর গ্রন্থনায় লেখিকার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হলেও 'গল্পরসের প্রবহমানতা' নষ্ট হয়েছে। সম্পাদক চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এ ভূমিকার প্রথমাংশে ও শেষাংশে প্রায় পরস্পরবিরোধী মন্তব্য করেছেন। তিনি প্রথমে বলেছেন -"..... ফুলমণি ও করুণা এখন থেকে বাংলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস হিসাবে মর্যাদালাভ করবে।" শেষাংশে তিনি বলেছেন -"..... তাঁর কাহিনী একালের আদর্শে ~~অনুসৃত আধুনিক ও সুসংবদ্ধ~~ যথার্থ উপন্যাস হয়ে উঠতে পারেনি এ ত্রুটি থাকল। ফুলমণি, করুণা, মার্থা ও মুক্তাবীর কাহিনীগুলি অনেকটা বিচ্ছিন্ন; এমন একটি মূল কাহিনী নেই যা উপকাহিনীগুলি কেন্দ্রাভিমুখী করতে পারে। দ্বিতীয় কারণ তাঁর গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্যের মধ্যে পাওয়া যাবে। নিচুতলার বাঙালী খ্রীষ্টানদের ধর্ম ও নীতির পথে আকৃষ্ট করবার জন্যই এই গ্রন্থ রচিত হয়েছিল।"[১৩] শেষোক্ত মন্তব্যই (একালের আদর্শে '- কথাগুলোর গুরুত্ব স্বীকার করেও) আমাদের নিকট সত্যের অধিকতর নিকটবর্তী বলে মনে হয়।

বাস্তবিকই, বইখানা 'The Week ' গ্রন্থের অনুবাদমাত্র, মোটেই মৌলিক রচনা নয়। "এর সর্বাঙ্গে সৌরভ অনুবাদ। বাক্যে - বাক্যে, শব্দে - শব্দে অনুবাদ। চরিত্রে অনুবাদ, ঘটনায় অনুবাদ। কাহিনী রচনার আদর্শ, মৌল উপাদান ও নক্সাটি পর্যন্ত অন্য একটি গ্রন্থ থেকে ~~[illegible]~~ সযত্নে যথাযথ গৃহীত। এরূপ অবস্থায় ফুলমণি ও করুণাকে আমরা বাংলায় অনূদিত উপন্যাস সমূহের ~~[illegible]~~ আদিসৃষ্টি সন্দেহে বলতে পারি, বাংলা সাহিত্যের প্রথম মৌলিক উপন্যাস বলতে পারিনা।"[১৪] প্রথম বা মৌলিক উপন্যাস না হোক, রচনাকালের বিচারে, ~~[illegible]~~

ঘটনাকালের পারম্পর্য এবং তারা ব্যবহারের দক্ষতায় এর গুরুত্ব অনস্বীকার্য ।

কাহিনীকাল এবং বর্তমান পাঠকের দিক থেকে ঐতিহাসিক কালের বিচারেও এ আখ্যান বাস্তবসম্মত এবং উপন্যাসের নিকট আত্মীয় । লেখিকা কাহিনী শুরু করেছেন এই বলে, - "কএক বৎসর হইল আমি বর্দ্ধমানের অন্তঃপাতী নদী তীরবর্তী এক নগরে বাস করিতাম ।" উল্লিখিত সময়টা সম্ভবত ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮৫০ এর মধ্যে কোনও সময় হবে । প্রথম অধ্যায়ে ফুলমণির সঙ্গে লেখিকার সাক্ষাতের সময় থেকে অন্টম অধ্যায়ে বর্ণিত কাহিনীর সময় প্রায় একবছর পরবর্তী । "আমি বলিলাম, হাঁ ফুলমণি, সে এক বৎসরের কথা প্রাচীন বটে , ... ।"(পৃ-১১৬) । এ সময়ের মধ্যে ফুলমণি ও করুণার সঙ্গে প্রায় সর্বক্ষণই তাঁর যোগাযোগ ছিল - শুধু মাঝখানে মাস দেড়েকের মতো সময় অসুখ থাকায় তিনি যোগাযোগ ঐ রাখতে পারেননি । এ কাহিনীর সীমা-ব্যাপ্তিকাল আনুমানিক এক বছরের কিছু বেশিই হয়ে থাকবে । কাহিনী এবং দৃশ্যপট-বর্ণনায় মাঝে মাঝেই নির্দিষ্ট সময়ের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায় । যেমন - "পূর্ব অধ্যায়ের লিখিত ঘটনার 'দশ বার দিন পরে' আমি পুনর্বার ফুলমণির গৃহে যাইতে বাসনা করিলাম । সে দিবস 'রবিবার', অতএব মনে ভাবিলাম, অদ্য যদি যাই, তবে বোধ হয় আমি ফুলমণির ছেলেদের দেখা পাইব;"(দ্বিতীয় অধ্যায়, পৃ-১৭) । সন-তারিখের নির্দিষ্ট উল্লেখ না থাকলেও ঘটনা-কালের উল্লেখ বেশ স্পষ্ট । গত শতাব্দীর প্রায় মধ্যভাগ এ কাহিনীর ঐতিহাসিক - সামাজিক কাল । গত শতাব্দীর প্রথম ভাগে বাংলার রাষ্ট্রীয় ও সমাজ-জীবনে যে ভাঙা-গড়া চলছিল তা সে সময় অনেকটা স্থিতিশীল পর্যায়ে পৌঁছেছিল । ধর্মীয় ব্যাপারেও অনুরূপ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল । লেখিকা আদর্শ শিক্ষয়িত্রী, যদিও উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়েই, শুধু বাঙালি গুটিকতক খ্রীষ্টান পরিবার, বিশেষ করে ঐ সকল পরিবারের মহিলাদের দৈনন্দিন জীবনাচরণের সাধারণ অভিজ্ঞতাই কাহিনীর উপজীব্য করেছেন । কিন্তু বিশেষ একটি অঞ্চলের বিশেষ জনগোষ্ঠীর(মধ্যবঙ্গ) জীবনযাত্রার খুঁটিনাটি বিবরণ সুন্দর হলেও বৃহত্তর সামাজিক গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্বমূলক সামগ্রিক পরিচয় এতে নেই । সেকারণেই লেখিকার খণ্ডিত জীবনবোধ ও অভিজ্ঞতার প্রকাশ কাহিনীকে সর্বজনগ্রাহ্য হতে দেয়নি । তবে, যুগের বিচারে সকলপ্রকার সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ' - এ যে সমাজ ও জীবনধারার পরিচয় দেয়, তা কৌতূহলপ্রদ এবং নিঃসন্দেহে

~~নিঃসন্দেহে~~ গুরুত্বপূর্ণ। উনিশ শতকের বাংলার সামাজিক ইতিহাসের মূল্যবান দলিল হিসেবে এ বই গণ্য হবে। বাংলা উপন্যাস রচনার ট্র্যাডিশনে এই বই আপাতদৃষ্টিতে পূর্বাপর বিচ্ছিন্ন ও সঙ্গতিহীন হলে হলেও বলিষ্ঠ প্রয়াস হিসাবে স্মরণীয়। কারণ সমকালীন ঘটনাধারার আশ্রয়ে রচিত 'আখ্যান' পর্যায়ে এ বই যথেষ্ট শক্তি সঞ্চার করেছে। পরবর্তী কথা সাহিত্যের ধারায় এর প্রভাব অনস্বীকার্য। (একদিকে উইলিয়াম কেরীর 'কথোপকথন' এবং অন্যদিকে 'চন্দ্রমুখীর উপাখ্যান' ও 'মূলীনার উপাখ্যান' - এর সঙ্গে এর সাদৃশ্য লক্ষণীয়। অনুবাদ হলেও তুলনায় 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ' — ~~এ প্রসঙ্গে~~ অনেক উন্নত পর্যায়ের)।

বাস্তবমুখী আখ্যান রচনার ধারায় এর পরের উল্লেখযোগ্য রচনা ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত প্যারীচাঁদ মিত্র ওরফে টেকচাঁদ ঠাকুর প্রণীত 'আলালের ঘরের দুলাল'। দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকায় প্রাণনাথ দত্তচৌধুরী বলেছেন - "ইহাতে ... মনুষ্যভাব যে প্রকার কৌশলে ও পারিপাট্যের সহিত চিত্রিত হইয়াছে, সেরূপ বাংলা ভাষায় আর দেখা যায়না। এক্ষণে অনেকেই নবন্যাস রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদিগের রচিত গ্রন্থগুলির নায়কাদির সরলভাব কালোচিত ও সঙ্গত নহে এবং পরিচ্ছদাদিরও বৈপরীত্য অনেক দেখা যায়(।) অধিক কি তাঁহাদিগের রচিত গ্রন্থপাঠে সময় ও স্থান সম্বন্ধে কিছুই অবগত হওয়া যায়না, এবং তাঁহাদিগের বর্ণিত নায়ক-নায়িকাদি কাহারও মূর্তি প্রতিবিম্ব পাঠকগণের চিত্তদর্পণে পড়েনা। 'আলালের ঘরের দুলাল' সেরূপ নহে ইহাতে আখ্যায়িকার সমকালিক দেশাচার ও অবস্থাদি দর্পণ[১৫] পতিত প্রতিবিম্বের ন্যায় স্পষ্ট এবং সর্বাঙ্গসুন্দররূপে চিত্রিত হইয়াছে।....।" মন্তব্যটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মোট ত্রিশটি অধ্যায়ে সমাপ্ত এবং ১৩১ পৃষ্ঠায় বিধৃত এ বইয়ের কাহিনীতে বাস্তবতা অবলম্বিত হলেও মনে হয় গ্রন্থ রচনা বা প্রকাশের সমকালীন বাস্তবতা এর অবলম্বন ছিলোনা। ১৮৫৪-৫৫ সালকে এ বইয়ের আনুমানিক রচনাকাল বলে ধরা হয় এবং সে সময়ে ইংরেজী শিক্ষা সম্পর্কিত প্রাথমিক দ্বিধাদ্বন্দ্বের প্রায় অবসান ঘটেছে। অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে এবং উনিশ শতকের প্রথমভাগে নবোদ্ভূত কোলকাতা নগরী ও তার বুকে হঠাৎ গজিয়ে ওঠা 'বাবু' সমাজের উদ্ভ্রান্ত কার্যকলাপ যেমন সেকালের অনেক কাহিনীর অবলম্বন হয়েছে, তেমনই এর প্রকাশ ঘটেছে প্যারীচাঁদের গ্রন্থেও। তবে এর স্থানিক পটভূমি কোলকাতা

কাটিয়ে বহুমূল বাংলায় শাস্ত পূর্বকাল পর্যন্ত প্রসারিত। অনেকেই মনে করেন, উনিশ শতকের প্রায় মধ্যভাগের পল্লীবাসীর নগরমুখী মানসিকতা ও হঠাৎ বড়োলোক বাবুদের তাৎক্ষণিক ক্রিয়াকলাপ এ উপন্যাসের পশ্চাৎপট নির্মাণ করেছে। কিন্তু সময়ের এ ধারণা সত্য বলে মনে হয়না। প্যারীচাঁদ নিজে হিন্দু কলেজের ছাত্র হলেও তাঁর কাহিনীর নায়ক মতিলালকে মাতৃভাষা-সংস্কৃত-ফারসি-ইংরেজি এই ত্রিধারের মধ্য দিয়ে শিক্ষালাভের পথ ধরে চলতে হয়েছে। উনিশ শতকের প্রায় মধ্যভাগে আদালত প্রভৃতিতে ফারসির ব্যবহার অপসৃয়মান, তার মধ্যে স্বয়ং ইংরেজি যে আসন দখল করতে সমুদ্যত। তার সাক্ষী দেয়, যে সময়ে নায়কের পিতা বাবুরাম বাবু বর্তমান থাকলে পুত্র মতিলালের সামনে তারা শিখার জন্য মুন্সী নিয়োগ করতেন না। তৃতীয় পরিচ্ছেদে 'হিন্দু কলেজে'র কথা বলা হয়েছে বলেই যে এমন ভাবা হয়েছে তা নয়। আলালের [illegible] কাল অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ যা ঊনবিংশ শতাব্দীর মাহাত্ম্য নয়, এর আখ্যানভাগ অন্ততপক্ষে ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়-তৃতীয় দশকের কাল-ভিত্তিতে গঠিত। [illegible] এদিক থেকে দেখলে 'নববাবু বিলাস' এবং 'আলালের ঘরের দুলাল'-এর কাহিনী প্রায় সমকালীন।

প্যারীচাঁদের জন্মেরও পূর্বে ১৮০০ সালে কোলকাতায় 'ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ' স্থাপিত হয়(১৮০০ সাল, মে মাস)। ১৭শ শতকের প্রায় শেষার্ধ পর্যন্ত হুগলীই ইংরেজদের প্রধান বাণিজ্যঘাঁটি ছিলো। যেদিন জব(জোব) চার্নক সাহেব সুতানটির ঘাটে তাঁর নৌকা ভেড়ালেন, [illegible] সেদিন থেকেই শুরু বলা চলতে পারে তার এ ইতিহাস। নবদ্বীপ, বারমহল, ঢাকা, মুর্শিদাবাদ [illegible] প্রভৃতির সমাধিক্ষেত্রের উপর গড়ে উঠল আধুনিক নগর কোলকাতা। অবশিষ্ট প্রায় মোগল সাম্রাজ্যের শেষভাগে কোম্পানীর বণিক সমাজের প্রচেষ্টায় অতি অল্পকালের মধ্যেই কোলকাতায় জাঁকজমকপূর্ণ নোতুন সভ্যতা জাঁকিয়ে বসে। তারপর সামাজিক মূল্যবোধের যে জোয়ার ছুটে ওঠে, তার ইতিহাস কালান্তরে চাপা থাকেনা। কালের প্রবাহে তার স্পষ্ট ছাপ পড়ে যায়। সমকালের জগৎ ও জীবন সম্পর্কে বাস্তব আগ্রহেই উদ্ভূত হল নবজাগরণবাদ। যুগের অভিজ্ঞতার মর্মে মর্মেই তার প্রভাব লক্ষিত হয়। সাধারণভাবে ১৭শ ও ১৮শ শতকের সাহিত্য ও সমাজে যে বলিষ্ঠ জীবনানুভবের অভাব দেখা যায়(যদিও কখনও কখনও চাপা আর্তিতে তা সুপরিস্ফুট -'এমন মানব জমিন রইলো পতিত/আবাদ করলে ফলতো /সোনা' - রামপ্রসাদ), ১৯শ শতাব্দীতে

মানবতাবাদী ভাবধারার মধ্যে তার মুক্তির প্রতিফলন অনায়াসেই লক্ষ্য করা যায় ।

কিন্তু এতৎসত্ত্বেও পূর্বোক্ত ভূমিকায় বর্ণিত 'নব্যন্যাস রচনায় প্রবর্ত্ত ব্যক্তিদের ত্রুটি থেকে আলালের লেখকও মুক্ত ছিলেননা । কাহিনীর দিক থেকে এর কালব্যাপ্তির সুস্পষ্ট উল্লেখ নেই । প্রথম দশটি পরিচ্ছেদে প্রায় দু'বছর কাল অতিক্রান্ত কিন্তু তারপর কতদিনের ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে তার হিসেব পাওয়া সহজ নয় । নির্দিষ্ট কালের সীমাতে গ্রন্থখানি পুরো ভারাক্রান্ত । যেমন, (১)'অল্পদিনের মধ্যেই প্রচুর ধন উপার্জন করিলেন ।(৬, পৃ—৫) । (২)'বাবুরাম বাবুর অবস্থা পূর্বে বড় মন্দ ছিল ।'(ঐ, ঐ)। (৩)'এইরূপে কিছুকাল যাপন করিয়া বাবুরাম বাবু বেনিয়ান হইলেন ... ।'(ঐ, ঐ) । (৪) বাবুরাম বাবু ভাবলেন, 'মতির ছেলে উঠিয়া যাইতেছে, এখন ইংরেজী পড়ান ভাল ।'(২, পৃ—৬) । এই পরিচ্ছেদেই আষাঢ়-শ্রাবণ মাসের উল্লেখ দেখা যায় - সালের বা তারিখের উল্লেখ নেই । (৫) মতিলাল এখন 'চৌদ্দ বৎসরের বালক ।'(৫, পৃ—১২) । (৬) 'একদিন প্রত্যুষে' মতিলালকে নিয়ে বেণীবাবু বেচারাম বাবুর কোলকাতার বাসায় এলেন ।(ঐ, পৃ—১৪) । পূর্ব-প্রসঙ্গে ইংরেজদের কোলকাতায় আগমন, সুপ্রিমকোর্ট স্থাপন ইত্যাদির কথা বলা হয়েছে । সন তারিখের কোনও উল্লেখ না থাকলেও ইতিহাসের সূত্র ধরে এখানে সময়ের ধারণা দেওয়া হয়েছে । (৭) 'শারদীয়া পূজার সময় উপস্থিত ।'(৪, পৃ—১৯) । (৮)'সময় জলের মত যায় - দেখিতে দেখিতে সোমবার হইল ।'(৭, পৃ—৩১) । (৯)'শ্বশুর মুখে ছাই দিয়ে ঘেটের কোলে মতিলালের বয়েস ষোল বৎসর হইল' - (১০, পৃ—৪৯) । (১০) চতুর্দশ পরিচ্ছেদে ফাল্গুন মাসের উল্লেখ আছে ।(পৃ—৬৫)। (১১)'বাদলে আজকাল ঘোরতর হইয়াছে, ঝিল্লি ঝী ঝী করিয়া ডাকিতেছে - চারিদিক জলময় -' ....।(২৭, পৃ—১১২) ।(১২)'আমার কথাটি ফুরাল, নটে গাছটি মুড়াল'- রূপকথার আদিতে সমাপ্তি । এরূপ অজস্র দৃষ্টান্ত আহরণযোগ্য ।

দ্বিতীয়ত, কাহিনী গঠনে উপকাহিনী বা শাখাকাহিনীর অত্যধিক বিস্তার ও পুঙ্খানুপুঙ্খদানে (এমনকি কোলকাতা নগরী ও জব চার্ণকের কথা বর্ণনা করায়) গল্পের গতিতে শ্লথতা এসেছে । সমকালীন সমাজজীবনের বাস্তব চিত্র পরিবেশিত হয়েছে কিন্তু ধারাবাহিকতা সত্ত্বেও লেখকের বাস্তব চেতনা তথা ঘটনার যথার্থ কার্যকারণ সূত্র প্রস্ফুটিত হয়নি । নির্বিশেষ হলেও তিনি বাস্তব সময় বা ব্যক্তির সময়ে আবদ্ধ জীবনকে

ধরার প্রয়াস পেয়েছেন। কিন্তু ঐতিহাসিকতার সময় অবহেলিত থেকেছে। বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে নিবিড় যোগাযোগের অভাবে প্রত্যেকটি খাপছাড়া অসংলগ্ন চিত্র সমষ্টিরূপে প্রতিভাত হয়েছে। পরিচ্ছেদ বা অধ্যায় বিভাজনের মাধ্যমে কাহিনী রূপায়ন হয়তো পুষ্ট পাঠকের ভাবনার বৈশিষ্ট্যবাহী কিন্তু তা কার্যকরী হয়নি। সাধারণ কৌতূহলের সূত্র ধরেই কাহিনীর অগ্রগতি ঘটেছে।

তৃতীয়ত, চরিত্রসৃজনের ক্ষেত্রে লেখক ব্যর্থ হয়েছেন। চরিত্রগুলিকে তিনি মানবিক গুণে সমৃদ্ধ করতে পারেননি। পাত্রপাত্রীরা যেন অবিমিশ্র ভাল বা মন্দের সমষ্টি জড়পিণ্ড বিশেষ। দু'একটি চরিত্রে সামান্য ~~[illegible]~~ গতিশীলতা চোখে পড়ে। চরিত্রগুলির প্রবৃত্তিজনিত মানসিক দ্বন্দ্ব প্রায় অনুপস্থিত ও পরিবর্তন বা প্রতিক্রিয়া স্বাভাবিক বলে মনে হয়না। কোনোপ্রকার উত্তেজনা বাইরে আলোড়ন সৃষ্টি করলেও অন্তরে তার প্রভাব পড়েনি। অধিকাংশ চরিত্রই স্থির এবং টাইপধর্মী। একমাত্র ঠকচাচার চরিত্রই ব্যতিক্রম। ব্যক্তি বনাম ব্যক্তি বা সমাজ - এ প্রকার দ্বন্দ্বমূলক প্রক্রিয়া চরিত্রের পরিবর্তনে সহায়তা করেনা। চরিত্রের যেটুকু রূপান্তর ঘটে, তা যেন লেখকের বিশেষ উদ্দেশ্যকে সফল করতেই - যার যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা মেলেনা। "ব্যঙ্গধর্মী উপন্যাসের চরিত্রসমূহ Fixed বা পরিবর্তনহীন চরিত্র হতে বাধ্য, কারণ চরিত্রের যে বিশেষ প্রবণতা আক্রমণের বিষয়বস্তু, পরিবর্তনশীল চরিত্রে তা বরাবর থাকতে পারেনা।"[২৬] তাছাড়া, কাহিনী প্রায় ক্ষেত্রেই সমাপ্তির মুখে এসে আকস্মিকভাবে চরিত্রের রূপান্তর ঘটে। সে রূপান্তর ঘটে বাইরের ধাক্কায়, অন্তরের তাগিদে নয়।

তাহলে বাংলা উপন্যাসের ঐতিহ্যে আলালের গুরুত্ব কী? ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, - প্যারীচাঁদ "ব্যবসা বাণিজ্য, আইন-আদালত, জমিদারী, মামলা-মোকদ্দমা প্রভৃতি নিখুঁত চিত্রে তৎকালীন দেশ-কাল-পাত্রের যথার্থরূপ ফুটিয়ে তুলেছেন।" (দ্র-প্যারীচাঁদ রচনাবলী, 'ভূমিকা', পৃ-৬৩)। দ্বিতীয়ত, বাংলা কথা-সাহিত্যের ক্ষেত্রে তিনিই প্রথম চেতনা ও কালপ্রবাহের সম্পর্ক অনুধাবন করেছিলেন, যদিও এর সার্থক রূপদানে তিনি সক্ষম হননি। তিনি বলেছিলেন, "সদুপদেশ ও সৎসংসর্গে সুমতি জন্মে, কাহার অল্পবয়সে হয় - কাহার অধিক বয়সে হইয়া থাকে। অল্প বয়সে সুমতি না হইলে বড় প্রমাদ ঘটে - যেমন বনে অগ্নি লাগিলে হু হু করিয়া দিগ্দাহ করে অথবা প্রবল বায়ু উঠিলে একেবারে বেগে গমন করত বৃক্ষ অট্টালিকাদি

ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলে সেইরূপ শৈশবাবস্থায় দুর্নীতি জন্মিলে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইয়া সহজে বয়সেতে ভয়ানক হইয়া উঠে । এ বিষয়ের ভূরি ভূরি নিদর্শন সদাই দেখা যায় । কিন্তু কোন কোন ব্যক্তি চিরকাল দুর্নীতি ও অসৎকর্মে রত থাকিয়া অধিক বয়সে হঠাৎ ধার্মিক হইয়া উঠে, ইহাও দেখিতে পাওয়া যায় । এইরূপ পরিবর্তনের মূল সদুপদেশ অথবা সৎসঙ্গ । পরন্তু কাহারো দৈবাৎ, কাহারো বা কোন ঘটনায়, কাহারো বা একটি কথাতেই কখন কখন হঠাৎ চেতনা হইয়া থাকে - এরূপ পরিবর্তন অতি অসাধারণ ।" (৩৬, পৃ-১২৪) ।

প্যারীচাঁদ বলেছিলেন, -" এই প্রকার দুরবস্থায় পড়িয়া অনবরত একাকী চিন্তা করাতে তাহার মনের গতি বিভিন্ন হইতে লাগিল । ... নদনদী, গিরি পূর্বের অবস্থা চিরকাল সমান থাকেনা - কালে কালেতে সকলেরই পরিবর্তন ও লয় হইয়া থাকে - সকলই অনিত্য - সকলই অসার ।" (৩৬, পৃ—১২০) । কার্যকারণ সম্পর্কহীন ~~[illegible]~~ চরিত্র পরিবর্তন যে স্বাভাবিক নয়, যে সম্পর্কে তাঁর জ্ঞানবোধ নিঃসন্দেহে আমাদের বিস্মিত করে । তিনি জানতেন - "ভোজন ও ধূম্রপানে থাকা যুবাকালেরই ধর্ম, কিন্তু আমরাতে পূর্বে সাবধান না হইলে এইরূপ ইচ্ছা ক্রমে ক্রমে বেড়ে উঠে ও নানা-প্রকার দোষ উপস্থিত হয় - সেই সকল দোষে শরীর ও মন অবশেষে একেবারে অধঃপাতে যায় ।" (২, পৃ—৪৪) । "[illegible] । বাবুরাম ও ঠকচাচা মতিলালের বিবাহের যোগাযোগ করিতে লাগিল । মতিলাল দুর্বল বুদ্ধিবশতঃ তাহাদিগের মিষ্টকথায় ভিজিয়া গিয়া মনে করিল যে পৃথিবীতে তাহাদিগের তুল্য আত্মীয় আর নাই । ..... যে লোকের ভিতরে সার থাকে সে লোক উচ্চপদ অথবা বিভব পাইলেও হেলে দোলেনা, কিন্তু যাহাতে কিছু পদার্থ নাই তাহার অবস্থার উন্নতি হইলে বানের ফুলের ন্যায় টলমল করিতে থাকে । .... তাও জড়ালে কাজের অভাব নাই, আর পুত্রের পক্ষেই শিক্ষার পাল দিন দিন বাড়িয়া যাইবে ।" (১৬, পৃ—৬১) ।

কিন্তু আদর্শের বাধায়, প্রচলিত রীতির হাত থেকে তিনিও রেহাই পাননি । কাহিনী বর্ণনায় বা চরিত্রচিত্রণে পাঠকের কৌতূহল তিনি মিটিয়েছেন, তাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে ধারালো করতে পারেননি । তিনি যা পারেননি, পরে বঙ্কিমচন্দ্র তা পেরেছিলেন । তবে এটুকু বলা যায়, সকল প্রকার সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও 'আলালের ঘরের দুলাল'ই প্রথম সর্বাধিক উপন্যাসের লক্ষণাক্রান্ত আখ্যান বা উপন্যাসের যথার্থ আবির্ভাবকে সুনিশ্চিত করেছে ।

বাংলা উপন্যাস রচনার প্রস্তুতিপর্বে বিশেষ পরিবর্তনের সঞ্চার করতে না পারলেও বঙ্কিম-পূর্ব দু'টি আধ্যাত্মিকামূলক রচনা এবং একটি ব্যঙ্গাত্মক সমাজ-নকশার উল্লেখ করা প্রয়োজন। এগুলি হল, রেভা. লালবিহারী দে প্রণীত 'চন্দ্রমুখীর উপাখ্যান', মধুসূদন মুখোপাধ্যায়ের 'সুশীলার উপাখ্যান' এবং কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা'। প্রথম দু'টি বই প্রকাশিত হয় ১৮৫৯ সালে। রচনা এবং প্রকাশ কালের বিচারে এ দু'টি বই 'আলালের ঘরের দুলাল'-এর অব্যবহিত পরবর্তী। কিন্তু কাহিনী পরিকল্পনা, চরিত্রচিত্রণ প্রভৃতি ব্যাপারে আলালের সমকক্ষতাও দাবী করতে পারেনা, উৎকর্ষ তো দূরের কথা। 'চন্দ্রমুখীর উপাখ্যান' 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ' এর অনুসারী। বিশেষ করে মিশনারী এবং খ্রীষ্টধর্মমাহাত্ম্য প্রচারের জন্যই এ বই রচিত। পাত্র-পাত্রীরা কেউই নিজের স্বভাবের তাগিদে কাহিনীতে প্রবেশ করেনি, লেখকের ইচ্ছানুযায়ী ঘটনার মধ্যে তাদের আগমন ও প্রস্থান ঘটেছে। ঘটনাও নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। 'চন্দ্রমুখীর উপাখ্যান'কে ড. দেবীপদ ভট্টাচার্য 'মৌলিক বাংলা উপন্যাস' বলে দাবী করেছেন।[২৬] অবশ্য প্রথম উপন্যাসের দাবি তিনি করেননি। প্রথম তো নয়ই, উপন্যাসও নয়। মৌলিকতা সম্পর্কে সুতরাং সন্দেহের অবকাশ নেই। কাহিনী অবশ্য, যদিও বিষয়বর্ণনা ধারাবাহিক কিন্তু কার্যকারণ সম্পর্কে ঘটনাবলী আবদ্ধ নয়। ফলে বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে গমন অনিবার্য হয়ে ওঠেনি। চরিত্রচিত্রণ স্থির প্রকৃতির। তাই 'চন্দ্রমুখীর উপাখ্যান' হলেও সেখানে চন্দ্রমুখীর ব্যক্তি অনুপস্থিতি পাঠকদের মনুষ্যত্ব কৌতূহল মেটাতেও ব্যর্থ হয়।

১৮টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত এ কাহিনীর অনেকটাই জুড়ে রয়েছে দেবচন্দ্র-নবকুমার সংবাদ। সমকালীন বাস্তবতা সুস্পষ্ট এর একমাত্র বৈশিষ্ট্য। কাহিনীকাল বা ঘটনার মোট ব্যাপ্তিকাল এবং তার অন্তর্ভাগ সম্পর্কে কোনো তথ্য জানা যায়না। দু' একটি তারিখ থেকে বোঝা যায় - প্রস্তাবিত রচনাকালের সমসাময়িক বা কিছু পূর্বের সমাজচিত্র স্থান পেয়েছে। ১৩শ অধ্যায়ে দেবচন্দ্রের উক্তিতে প্রকাশ :- "... বিধবাদের বিবাহ প্রচলিত হইলে অনেক অত্যাচার লুপ্ত ও প্রচুর মঙ্গল হইবে। আর এ বিষয়ে অনেক সুপণ্ডিত ও বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ মনোযোগী হইয়াছেন। অল্পদিন গত হইল এক ক্ষুদ্র পুস্তক প্রকাশ হইয়াছিল যাহাতে বিধবাদের বিবাহ যে শাস্ত্রসম্মত ইহা অতি সুবিচারপূর্ব প্রমাণ করা হইয়াছে।" (পৃ--৫৩)।

'চন্দ্রমুখীর উপাখ্যান'-এর (প্রথম সংস্করণ, জুন, ১৯৬৮) 'অভিবাচন'-এ ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন - "...... টেকচাঁদের বাস্তবদৃষ্টি চন্দ্রমুখী - লেখকের ছিলনা । তবে তাঁর ছিল কৌতুক-উজ্জ্বল পর্যবেক্ষকের সরস চোখ । তার পরিচয় রয়েছে পল্লী চিত্রের উৎকর্ষগুলিতে, মানব চরিত্রের অঙ্কনগুলিতে । চন্দ্রমুখী উপন্যাস নয়, বড় গল্পও নয় । চন্দ্রমুখী বিগত শতাব্দীর বাংলাদেশের এক অঞ্চলের কমনীয় চিত্রমালিকা ।" এমত পর্যবেক্ষণই গ্রহণযোগ্য মনে হয় । সমকালীন সমাজচিত্রের অন্তাংশ অঙ্কন ব্যতীত এ আখ্যানের অন্য গুরুত্ব নেই । বাংলা উপন্যাসের ধারায় এ ধরণের আখ্যায়িকা পূর্ণ পরিণত হবার পূর্বেই বিলুপ্ত হয়েছে ।

তিনটি অংশে বিন্যস্ত 'সুশীলার উপাখ্যান' মুলেন্সের কাহিনী-ধারানুসরণে রচিত বিস্তৃততর ও তথ্যপূর্ণ আখ্যান হলেও উন্নত মানের নয় । বাল্যকাল থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সুশীলার জীবনকাহিনী এখানে বর্ণিত হয়েছে । প্রসঙ্গক্রমে লেখক স্ত্রী-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন । কৌলীন্যপ্রথা, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, 'অজ্ঞতাপ্রযুক্ত প্রসূতি ও নবজাত শিশুর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে উদাসীন্য প্রভৃতি নানাবিধ কুসংস্কার ও কুপ্রথার' আলোচনায়ও লেখক অবতারণা করেছেন । এর আখ্যানভাগ গৌণ, লেখকের বিশেষ মতবাদের প্রচারই মুখ্য । স্ত্রী শিক্ষা বা নারী-চরিত্রাঙ্কন - কোনও দিক দিয়েই 'সুশীলার উপাখ্যান'কে ঠিক উপন্যাস বলা যায়না। বঙ্কিমপূর্ব যুগে রচিত এ ধরণের আখ্যায়িকার মধ্যে এটাই সর্বশেষ ।

ঘটনার কালানুক্রম, কার্যকারণ সম্পর্ক ও সম্ভাব্যতার বিচারে 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ', 'চন্দ্রমুখীর উপাখ্যান' ও 'সুশীলার উপাখ্যান' তেমন উল্লেখযোগ্য না হলেও অন্য একটি কারণে বাংলা উপন্যাসের ঐতিহাসিক সৃষ্টিতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । উনিশ শতকের নবজাগৃতির অন্যতম ফলশ্রুতি নারী-স্বাধীনতার বাণী উচ্চারণ । এতোকাল তাঁদের পুরবন্দীর জীবন যাপন করতে হতো । পুরুষদের মতো সমাজস্বীকৃত কোনো অধিকারই তাঁরা ভোগ করতে পারতেন না । সুদীর্ঘ সুষুপ্তি ও হীনমন্যতার ঘোর কাটিয়ে উঠে তাঁরা ক্রমে ক্রমে বাইরের জগতে পুরুষের সঙ্গে সমতালে পা ফেলতে চাইছেন । বহু শতাব্দীর মতো কিছু কুসংস্কার তাঁদের একদিন আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছিল, তা ছিন্ন করতে এখন তাঁরা বদ্ধপরিকর । উপাখ্যানসমূহের নায়কস্বরূপ নারীদের প্রাধান্য উনিশ শতকের নারী প্রগতিরই পরিচয়বাহী । যদিও লেখকদের মধ্যে প্রগতিবাদী ও রক্ষণশীল মানসিকতার বিপরীতমুখী টান একই সঙ্গে বর্তমান থাকায়

তাঁদের অঙ্কিত নারীচরিত্রগুলি আত্মস্ফূর্তির নিরঙ্কুশ ঘোষণা করে উঠতে পারেননি, তথাপি পথ প্রস্তুত করেছিলেন নিশ্চয়ই । সচেতন শিল্পী বঙ্কিমচন্দ্র কি তাঁর উপন্যাস রচনার প্রথম পর্যায়ে এঁদের দ্বারা প্রভাবিত হননি ? পূর্বোক্ত লেখকদের স্বপ্ন সম্ভবকে ধরার চেষ্টা বঙ্কিমচন্দ্রে এসে পূর্ণতা পেয়েছিলো একথা নির্দ্বিধায় বলা চলে । তাঁর প্রথম পর্বের উপন্যাসগুলির নায়করূপে এবং বক্তব্যে নারীসমাজের স্বাধিকারের প্রশ্ন এবং নারীত্বের জাগরণ প্রাধান্য পেয়েছে । তাই মনে হয়, বঙ্কিমচন্দ্র আয়েষার মুখ দিয়ে 'এই বন্দী আমার প্রাণেশ্বর' - এই ধরনের উক্তি করিয়েছেন এবং স্বভাবতই সমকালের ন্যায়সংগত দাবিকে সোচ্চারে কি বলতে না পেরে অতীতের অনুকূল প্রেক্ষাপটে তার প্রবেশ ঘটিয়েছেন ।

উপন্যাস হিসেবে কিংবা উপন্যাস রচনার প্রচেষ্টা হিসেবে 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা'র গুরুত্ব নেই । বস্তুত, লিখিত বিন্যস্ত কাহিনী রচনা কালীপ্রসন্নের উদ্দেশ্য ছিলনা । তিনি সমকালবর্তী কোলকাতার বিশেষ বিশেষ উৎসবঅনুষ্ঠান এবং অন্য কিছু ভিন্ন ভিন্ন জাতের ঘটনা উপলক্ষ্য করে ব্যঙ্গের শাণিত বাণ নিক্ষেপ করেছেন । পরিশীলিত বাবুসম্প্রদায় ও সমাজের প্রভাবে আমাদের সমস্ত জীবনচর্যা কিভাবে অধঃপাতে যায় তা লক্ষ্য করে তিনি বেদনা অনুভব করেছেন এবং তারই তাঁর আক্রমণের লক্ষ্য বস্তু স্বরূপ চিহ্নিত করেছেন । ধারাবাহিক আখ্যায়িকা রচনার প্রয়াস না থাকায় 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা' একক ও স্বতন্ত্র মর্যাদার অধিকারী ।

বাংলা সাহিত্যের প্রথম-সার্থক ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র সম্ভবত যাঁর দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন তিনি বঙ্কিমের সুহৃদ ভূদেব মুখোপাধ্যায় । ভূদেবের 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' (যার মধ্যে সফল স্বপ্ন' ও 'অঙ্গুরীয় বিনিময়' নামে দুটি কাহিনী রয়েছে) ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় । কন্টারের "Romance of history" কাহিনী দুটির অবলম্বন হলেও প্রকৃতপক্ষে ভূদেবের হাতে তা অনেকটা মৌলিক কাহিনীর রূপ লাভ করেছে । দুটি কাহিনীর মধ্যে দ্বিতীয়টি অর্থাৎ 'অঙ্গুরীয় বিনিময়' "ঐতিহাসিক-জাতীয় রচনার সাধারণ আদর্শ ও মূলসূত্র প্রবর্তনের কৃতিত্বের অধিকারী ।"[৬০] ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন, -"আকারে অঙ্গুরীয় বিনিময় বড় গল্পের মতো, প্রকারে ইহাতে নভেলের সম্পূর্ণতা আছে । ঐতিহাসিক পরিবেশ ক্ষুণ্ণ হয় নাই ।"[৬১]

মারাঠা বীর শিবজী(ইতিহাসের শিবাজী) ও মোগল সম্রাট ঔরঙ্গজীবের কন্যা রোশিনারার প্রণয়কাহিনী নিয়ে গড়ে উঠেছে এর বিষয়বস্তু। বারোটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত প্রায় ৬০ পৃষ্ঠার এ কাহিনী। সময়ের নির্দিষ্ট উল্লেখ না থাকলেও ঐতিহাসিক পাত্র-পাত্রীর অবস্থান ও সংশ্লিষ্ট ঘটনার নিরিখে ঐতিহাসিক কাল জ্ঞাত হওয়া যায়। পূর্ব প্রসঙ্গের জের টেনে শিবজীর বংশের কথাও লেখক বলেছেন। মোট ঘটনাকালের ব্যাপ্তি অবশ্য বলা সম্ভব নয়। লেখক কালের অতিক্রমণ দেখিয়েছেন নির্দিষ্ট সময়ের উল্লেখের মাধ্যমে। 'এইরূপে তিন রাত্রি গত হইল', (১, পৃ-১৮৪); 'রোশিনারা সেই স্থানে কিছুকাল বাস করিতে করিতে ক্রমে শিবজীর সহিত এবং সাধুর ভাবে পরিচিতা হইলেন'(২, পৃ-১৮৮); 'অধ্যায় এইরূপে গত হইল, তিনি অতি মৃদু পদক্ষেপে স্থানে স্থানে পুনঃ পুনঃ বিশ্রাম করতঃ প্রস্থান করিতে লাগিলেন', (৩, পৃ-১৯২); 'এইরূপে কিছুদিন গত হইল।'(৩, পৃ-১৯৩); 'সেই রাত্রি দুই প্রহর সময়', (৩, পৃ-১৯৩); 'রোশিনারা কতিপয় দিবস পরে পথিমধ্যে রাজা জয়সিংহের সৈন্যে উপস্থিত হইলেন।'(৩, পৃ-১৯৭); 'দুর্গ জয় হইবার তিন বা চারি দিবস পরে' - এ প্রকার নির্দিষ্টের কাল সম্বলিত বাক্য বা বাক্যাংশের বহুল প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। গল্পের ধারাবাহিকতা এবং ঘটনার সঙ্গতরক্ষা যথাযথভাবে রক্ষিত হয়েছে। বঙ্কিমের 'দুর্গেশনন্দিনী' রচনায় এর স্পষ্ট ছায়াপাত ঘটেছে বলে মনে হয় এবং পরবর্তীকালে(বঙ্কিম সমসাময়িক এবং বঙ্কিমোত্তর) এই ধারা বহু উপন্যাসের জন্ম দেয়। বঙ্কিম সমসাময়িক কালে রমেশচন্দ্র দত্ত, সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, প্রতাপচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি লেখকগণ প্রাথমিকভাবে ভূদেব দ্বারা প্রভাবিত এবং পরে বঙ্কিম কর্তৃক অনুপ্রাণিত এবং বঙ্কিমরীতি অনুসারী। বাংলা উপন্যাসের ধারায় ভূদেবের রচনার মূল্য অপরিসীম। প্রমথনাথ বিশী যথার্থই বলেছেন, -"ভূদেবের উপন্যাস পড়িলে শুধু ভূদেবকে নয়, বঙ্কিমের উপন্যাসের সৃষ্টিও বিবর্তনে তাহার প্রভাব সম্বন্ধেও একটা ধারণা হইবে।"[৩২]

বঙ্কিম-সমসাময়িক এবং বঙ্কিম-পরবর্তী ঔপন্যাসিকদের মধ্যে একমাত্র রমেশচন্দ্র দত্ত ছাড়া আর কেউই ঐতিহাসিক উপন্যাসের আঙ্গিক বৈশিষ্ট্য ও মূলসুর অনুধাবন করতে পারেননি। রমেশচন্দ্রই সার্থকভাবে কালের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। অন্যান্যদের মধ্যে 'বঙ্গাধিপ পরাজয়'(১ম - ১৮৬৯, ২য় - ১৮৮৪) এর লেখক প্রতাপচন্দ্র ঘোষ

ঐতিহাসিক তথ্যপুঞ্জের সমাবেশ দ্বারা কল্পনার রস জমাট করতে চেয়েছেন। ফলে ঔপন্যাসিক হিসেবে উত্তরকালকে প্রভাবিত করতে ব্যর্থ হয়েছেন। সমকালে বঙ্কিম সঞ্জীবচন্দ্রের লেখা দুটো উপন্যাস 'কণ্ঠমালা' ও 'মাধবীলতা' সম্পর্কে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়-এর বক্তব্য সংক্ষিপ্ত হলেও তাৎপর্যপূর্ণ। "তাঁহার বড় উপন্যাসদ্বয় - 'মাধবীলতা' ও 'কণ্ঠমালা' - উপন্যাস হিসাবে অসম্পূর্ণতা ও রচনায় কৌশলের অভাবের পরিচয় দেয়, তাহাদের মধ্যে খাঁটি উপন্যাসের রস জমাট বাঁধে নাই।"[৩৩] কণ্ঠমালার(১৮৭৭) তুলনায় মাধবীলতা(১৮৮০) পরে প্রকাশিত হলেও মাধবীলতার কাহিনীকাল মনে হয় সুদূর অনির্দিষ্ট অতীত। কিন্তু কণ্ঠমালার কাহিনী সমকালীন। উভয় উপন্যাসের কাহিনীই শিথিল-বিন্যস্ত। কাহিনী ও চরিত্রে বহুক্ষেত্রেই কাল্পনিকতা ও অসম্ভব ঘটনার ছড়াছড়ি। উপন্যাসের ঐতিহ্যে সঞ্জীবচন্দ্র কোনো নোতুন মাত্রা যোগ করতে পারেননি। তুলনায় স্বর্ণকুমারী দেবী অধিকতর কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন।

'দুর্গেশনন্দিনী' বঙ্কিমের এবং বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক উপন্যাস হলেও বঙ্কিম কিন্তু তার পূর্বেই ইংরেজিতে 'রাজমোহনস ওয়াইফ' নামে একটি উপন্যাস লিখেছিলেন। বলা বাহুল্য, এ উপন্যাসে বঙ্কিম সমকালীন সমাজ ও পরিবারকেন্দ্রিক বাস্তবতারই উপজীব্য করেছিলেন। পরে 'দুর্গেশনন্দিনী'তে যে পরিপুষ্টি তাঁর আয়ত্ত ছিল তাকেই তিনি দীর্ঘকাল লালন করেছেন। বিষবৃক্ষের(১৮৭৩) পূর্বে সমকালীন দেশ ও সমাজস্বাতন্ত্র্য তাঁর উপন্যাসে গৃহীত হয়নি। তাঁর রচিত কথাসাহিত্যের বেশীর ভাগই রোমান্স কিন্তু বিস্ময়ের কথা, তাঁর রোমান্টিক আখ্যায়িকাগুলির মধ্যেও বাস্তব রসের সঞ্চার এবং জীবনের সুগভীর প্রশ্নের সমাধান প্রয়াস লক্ষ করি। তাঁর কালচেতনা এবং উপন্যাসে কালের নিবিড় যোগ্য সংযোজন পূর্ববর্তী ঔপন্যাসিকদের তুলনায় তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও অনন্যতাই প্রমাণ করে। অবশ্যই মনে রাখতে হবে, পাশ্চাত্য কথাসাহিত্যের আদর্শে অনুপ্রাণিত হলেও দেশীয় আদর্শকে তিনি বিস্মৃত হননি। বরং বলা যায়, তাঁর রচনায় জাতীয় ঐতিহ্যের অনুবর্তন ও পুষ্টিই ~~[illegible]~~ লক্ষিত হয়। সমালোচকদেরও এই মত।[৩৪] অতীতাশ্রয়ী বা সমকালীন - তাঁর সকল প্রকার উপন্যাসের মধ্যেই সমসাময়িক বিচিত্র ভাবনার প্রতিফলন দেখি যা পরবর্তী বহু ঔপন্যাসিককে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। বিষবৃক্ষ, কৃষ্ণকান্তের উইল প্রভৃতি উপন্যাসের মধ্যে বঙ্কিম তাঁর নিজ কালের কতকগুলি প্রশ্নের নীতিজ্ঞানভিত্তিক সমাজ-

~~সমাজ নির্ভর~~ পারিবারিক ঘটিত সমস্যার উপস্থাপনা ঘটিয়েছেন এবং তার নৈতিক ও আদর্শায়িত সমাধানের ইঙ্গিত দিয়েছেন। ধারাবাহিক বিবৃতিমাত্র নয়, বাইরের ঘটনা-প্রবাহকে চরিত্রের দৃষ্টিভঙ্গির উপস্থাপনার সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে তার রূপায়ণ ঘটানো হয়েছে। পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে এ বিষয়ে আরও আলোচনা করা হবে।

বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর(১৮৯৪) সঙ্গে সঙ্গেই বঙ্কিমযুগেরও অবসান ঘটে এবং সূচনা হয় রবীন্দ্রযুগের। কিন্তু সেইসময়েই ~~[illegible]~~ বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব অনুসরণ এবং অনুকরণে বহু ঐতিহাসিক উপন্যাসের প্রাদুর্ভাব লক্ষিত হয়। এদের মধ্যে 'ঐতিহাসিক রস' এর কণামাত্রও ছিলোনা শুধু বাগাড়ম্বর ছিলো। সেগুলি এতই শীর্ণজীবী ছিলো যে, কল্পনার কিংবা অনুকরণের অন্তর্ধানে(বা অভাবে) তারা ধীরে ধীরে লোকচক্ষুর অন্তরালে আত্মগোপন করতে থাকে এবং মহাকালের সীমা পেরুতে না পেরুতেই সেগুলি সম্পূর্ণভাবে লুপ্ত হয়। সাম্প্রতিক কালে আবার ঐতিহাসিক উপন্যাসের আবির্ভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে। কিন্তু সেগুলির মধ্যে কল্পনার ঐশ্বর্যের পরিবর্তে কাল্পনিকতার উৎকট প্রয়োগ ও অবিশ্বাস্য ঘটনার বাড়াবাড়ি থাকায় সেগুলি বাস্তব-মূলক সামাজিক উপন্যাসের পাশে অধিকার করে নিতে পারছেনা। তাছাড়া, ঔপন্যাসিকের দৃষ্টি এখন ব্যক্তিজীবনে বেশি চরিত্রের অন্তর্বিশ্লেষণে মনোযোগী হয়েছে, সেজন্য নূতন যুগের ঘটনা বর্ণনা প্রধান কাহিনি [illegible] আধুনিক পাঠকদের মন সন্তুষ্ট করতে পারছেনা। একসময়ে ঐতিহাসিক উপন্যাস(এবং অতি দুঃসাহসী কাল্পনিক কাহিনী) এত বেশি সংখ্যায় রচিত হয়েছিল যে তাতে পাঠকের মন বিতৃষ্ণ বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়। এর প্রধান কারণ বোধ হয় এই যে, একালের সচেতন পাঠক এখন কাহিনীর পাত্রপাত্রীর জীবনে আত্মপ্রতিফলন খুঁজে পায়নি। বাংলা উপন্যাসের ঐতিহ্যে ভূদেব-বঙ্কিমচন্দ্রের নোতুন যাত্রা শুরু করলেও যথার্থ ঐতিহাসিক উপন্যাস আজ অতীতের বস্তু মাত্র।

'স্বর্ণলতা' রচয়িতা তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বঙ্কিম-পর্বে একজন উল্লেখযোগ্য ঔপন্যাসিক ছিলেন। 'স্বর্ণলতা'(রচনাকাল ১৮৭৩) বঙ্কিমের বিষবৃক্ষের প্রায় সমকালীন এবং সমস্যাযুক্ত সাধারণ বাঙালিজীবনের পটভূমিকায় রচিত। এ গ্রন্থে বাস্তব জীবনের হাসি-কান্না, আনন্দ-বেদনার মধ্যেই উপকরণের যোগান দেওয়া হয়েছিল, এবং তাতে তারকনাথ সমকালের সমালোচকদের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করেছিলেন।

বঙ্কিম যুগের অন্যান্য লেখকেরা যখন বঙ্কিম-প্রভাবে আচ্ছন্ন হয়ে বঙ্কিম-মণ্ডলে আবর্তিত হয়েছেন, তখন একমাত্র তারকনাথ মুক্ত দিক্‌চিহ্ন নির্দেশের প্রয়াসে ব্যাপৃত ছিলেন। বঙ্কিম নিতান্ত সাধারণ মাটির মানুষকে যে মর্যাদার আসনে অভিষিক্ত করতে কুণ্ঠিত হয়েছিলেন তারকনাথ কথা সাহিত্যের আসরে তাদের সুমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তারকনাথ আদর্শায়িত বাঙালাদেশের চিত্র না এঁকে নিখুঁত বাস্তব বর্ণনায় চিকিৎসকের দৃষ্টি নিয়ে সমকালে বাঙালির সমাজ ও ঘরোয়া পারিবারিক জীবনে যে দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেছিলেন তাই তাঁর উপন্যাসের বিষয় করেছিলেন। কিন্তু শুধু প্রত্যক্ষদর্শী বাস্তবতার নিখুঁত বর্ণনাই উপন্যাসের টিকে থাকার একমাত্র মাপকাঠি হতে পারেনা। যে অভিনিবিষ্ট জীবনবোধ ও আঙ্গিক কুশলতা লেখককে অমরত্ব দিতে পারে তা তারকনাথের ছিলোনা। কাহিনী ও চরিত্রসৃজনে আকস্মিক যোগাযোগ ঘটিয়ে কার্যকারণসূত্র ও সম্ভাব্যতার প্রয়োগে তিনি ব্যর্থ হয়েছেন। 'ক্ষুদ্রমতীর উপাখ্যান'-এর মতো শিথিল বিন্যাস তাঁর গ্রন্থের অন্যতম ত্রুটি। এ কারণে সমকালে যথেষ্ট প্রশংসা কুড়িয়েও শেষ পর্যন্ত কোনো প্রভাব না রেখেই বিদায় নিতে হলো 'স্বর্ণলতা'কে।

বঙ্কিম-যুগের পর বিরাট শক্তি নিয়ে আবির্ভূত হলেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর প্রথমদিকের কথাসাহিত্যে রোমান্স প্রবণতা ও ঐতিহাসিক উপন্যাসের অনুসৃতি লক্ষ্য করি। কিন্তু কিছুকালের মধ্যেই তিনি 'চোখের বালি' (১৯০৩) রচনা করে উপন্যাসের ট্র্যাডিশনে নতুন মাত্রা যোজনা করেন। ~~[illegible]~~ তাতে বঙ্কিমের বিষবৃক্ষ, কৃষ্ণকান্তের উইল ও রজনীকে আর এক ধাপ এগিয়ে দেওয়া হলো। বস্তুত বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয় এ সময় থেকেই। এতোকাল উপন্যাসে যে বহির্বাস্তবতা বা ঘটনাবাস্তবতার উপস্থিতির সাক্ষাৎ আমরা পেয়েছি তার পরিবর্তে এই প্রথম স্পষ্ট অন্তর্বাস্তবতার সন্ধান পেলাম। এ বাস্তবতার মূল কথা হচ্ছে - পাত্রপাত্রীর অন্তরের গভীরে দৃষ্টিনিক্ষেপ করে তাদের মনের কথা বের করে আনা। এতে নরনারীর নিগূঢ় মনোবিশ্লেষণের মাধ্যমে অন্তর্জীবন উদ্ঘাটিত করা হয়। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন - "সাহিত্যের নবপর্যায়ের পদ্ধতি হচ্ছে ঘটনা পরম্পরার বিবরণ দেওয়া নয়, বিশ্লেষণ করে তাদের আঁতের কথা বের করে দেখানো। সেই পদ্ধতিই দেখা দিল চোখের বালিতে।"[৩৫] ব্যক্তি হৃদয়ের রহস্য-উদ্ঘাটন এতে অবশ্য করণীয় বলে বিবেচিত। ঘটনাসংস্থান এবং চরিত্রের মনোলোকের

পাত্র বিশ্লেষণ লেখকের কল্পনাশক্তির ব্যাপ্তি ও গভীরতা উভয়েরই প্রমাণ করে । ব্যক্তির মধ্যে ব্যক্তির ও সমাজের দ্বান্দ্বিক রূপায়ণ এখন থেকে উপন্যাসে লক্ষ্য হতে থাকে, ফলে এর আঙ্গিকগত জটিলতাও বৃদ্ধি পেতে থাকে । তাঁর 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে ঘরের - বাইরের তীব্র সংঘাত প্রকটিত; একদিকে রাজনীতিগত এবং অন্যদিকে মূল্যবোধগত দ্বন্দ্ব পাত্র-পাত্রীর মনস্তত্ত্বগত দ্বন্দ্ব-জটিলতা সৃষ্টি করেছে । যে কোনও দিক থেকে আলোচনা করলে তাঁর সব উপন্যাসেই সূক্ষ্মতর পরিচয় উপলব্ধি করা যায় । তাঁর হাতে প্রথম শুধু উপন্যাসের উপকরণ বিশেষ নয়, ব্যক্তির মনের গতি বা উচ্চাকাঙ্খার মধ্যে যা ওতপ্রোতভাবে জড়িত - নিস্তরঙ্গ প্রাত্যহিকতা নয়, প্রাবল্য বিপর্যয় সৃষ্টিকারী শক্তিশালী হাতিয়ার । সংক্ষেপে বলতে পারি প্রথম রবীন্দ্রযুগব্যাপী এই অন্তর্বীক্ষণতা তথা মনোবিশ্লেষণের প্রবণতা উপন্যাসের প্রধান অবলম্বন থাকে । শুধু রবীন্দ্রনাথ নন, শরৎচন্দ্র সহ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ডাঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ লেখকেরা এ ধারায় অবগাহন করে বিশেষ উল্লেখযোগ্য উপন্যাস রচনার মাধ্যমে উপন্যাসের বাস্তব-অনুসন্ধানমূলক এ ধারাকে আরো এগিয়ে দেন । তা সত্ত্বেও এঁদের কেউ কেউ হারিয়ে গিয়েছেন বিস্মৃতির অতল গহ্বরে । শরৎচন্দ্রের রচনার মধ্যে পুরাতন ও নোতুন ~~আদর্শের~~ ভাবাদর্শের মিলন লক্ষ্য করা যায় । তিনি একদিকে যেমন দেশীয় ঐতিহ্য আশ্রয়ের অন্যদিকে তেমনই আধুনিক বৈচিত্র্যময়ীর ধাঁচে নোতুন ঐতিহ্য সৃষ্টিতে তৎপর । নরনারীর পারস্পরিক সম্পর্ক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে, চিরাচরিত সংস্কার ও মূল্যবোধের সমালোচনায় যে মৌলিকতা তিনি দেখিয়েছেন তাকে স্বীকার করে নিয়েও বলা যায়, বাংলা উপন্যাস রচনার প্রচলিত ধারাতেই তিনি বিশ্বাসী ।

বিকাশমান এই ধারার শেষ পর্যায়েই সাহিত্যের অন্যান্য শাখার ক্ষেত্রে যেমন, তেমনই উপন্যাসের ক্ষেত্রেও আবির্ভাব ঘটে বিভিন্ন বৈচিত্র্যের । একদিকে পরাধীনতা থেকে মুক্তিলাভের উদগ্র বাসনা, অন্যদিকে মানবমনের নানামুখী গতির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ; একদিকে মানুষের জৈব-প্রবৃত্তি-কামনা-বাসনার অনাবৃত উৎকট প্রকাশ, অন্যদিকে শুচিশুভ্র সৌন্দর্যময় শিল্পের আবেদন বস্তুজগতে সমন্বয় মানবমনের বিচিত্রমুখিতারই প্রকাশ । সম্প্রতি চলছে 'চেতনা প্রবাহে'র রাজত্ব । এ সবই দাঁড়িয়ে আছে বাস্তববাদের শক্ত ভিতের উপর । এখন 'বাস্তব' অর্থে বোঝায় ব্যক্তির মন নামক সত্তা । সেখানে পুরোপুরি বাদ দেওয়া সম্ভবনা । তবে যেহেতু দৈহিক কামনা, জৈবিক ভোগস্পৃহার

নিয়াবক মন তাই তারই প্রাধান্য স্বীকৃত । আর মন মানেই চেতনাদি স্তর সমন্বিত একটি বিশেষ অবস্থা - যা দেশ-কালের বিশেষ গণ্ডীতে বাঁধা পড়েনা । এক মুহূর্তের ভগ্নাংশে যা পার হয়ে যেতে পারে হাজার হাজার মাইলের দূরত্ব, হাজার হাজার বছরের ব্যবধান তারই সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্মতর বিশ্লেষণ সাম্প্রতিক কালের উপন্যাসে রূপায়িত হচ্ছে । তবে আজও তিনি সমাজমনস্ক মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাপন প্রণালীর যাথার্থ্য অভিজ্ঞতা । বাস্তববাদের প্রাথমিক ধারণার উপকরণই - যদিও ভিন্ন আকারে ও প্রকারে - আজকের উপন্যাসের প্রাণ । বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্কর, মানিক প্রমুখ ও কল্লোল - কালিকলম যুগের ঔপন্যাসিকেরা তাই সচেতনভাবে তথা সমাজ বাস্তবতার খাঁটী পরিচয় দিয়েছেন। জীবন ও সমাজ যে নিত্য পরিবর্তনশীল, মানুষে-মানুষে সম্পর্ক যে চিরকাল একই অনুপাতে দাঁড়িয়ে থাকেনা, সমাজ-পরিবার-রাজনীতি-অর্থনীতি-ধর্মনীতি আদর্শের বদলাই, প্রাচীন কালের যৌথজীবন ও কৃষিভিত্তিক যুগ রূপান্তরিত হলো নিয়মিত পালাবদল ঘটেছে - এসব ঔপন্যাসিকদের রচনায় তার প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে । সেই সময়ে প্রকাশিত হয়ে পড়ে "জীবনের কথা"র ভাবনা । ~~[illegible]~~ অর্থাৎ বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ তাঁদের পূর্বকালের ভাব-ভাবনার মধ্যে নিযুক্ত না হয়ে উপন্যাস রচনার যে প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছিলেন তাই সুরু হল নতুন রূপে ~~[illegible]~~ লেখকদের কালচেতনা ও জীবনজিজ্ঞাসায় নোতুন নোতুন মাত্রা যোগ করে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত প্রবাহমান রয়েছে এবং ভবিষ্যৎ অবধি নিরন্তর এগিয়ে চলেছে ।

[ক্রমশঃ]

॥ উপন্যাসের সাধারণ বৈশিষ্ট্য ॥

উপন্যাস একটি বিশেষ সাহিত্য শাখা। কোন্ কোন্ বিশেষ উপাদান উপন্যাসের অবয়ব নির্মাণ করেছে এবং এর অন্তর-স্বরূপের পরিচয় উদ্ঘাটনে নিয়োজিত হয়েছে তা দিয়েই অন্যান্য সাহিত্য-শাখার সঙ্গে এর পার্থক্য নিরূপণ করা সম্ভব। আর তখনই উপন্যাসের সাধারণ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা করা যাবে। যদিও বিভিন্ন দেশে একই সময়ে উপন্যাসের উদ্ভব কিংবা বিকাশ ঘটেনি এবং সকল দেশের সমাজ-মানসও একরূপ নয় তাহলেও এর সাধারণ লক্ষণে বিশেষ কোন হেরফের লক্ষিত হয়না।

উপন্যাস সর্বগ্রাসী। সাহিত্যের অন্যান্য সকল শাখা এবং তাদের অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ যথা কাব্য, নাটক, প্রবন্ধ, গল্প বা কাহিনী এবং সমাজ, ধর্ম, দর্শন, রাজনীতি, অর্থনীতি, ইতিহাস প্রভৃতি সকলই উপন্যাসের বিষয়ীভূত হতে পারে। তবে কবিত্ব, নাটকীয় সংঘাত, মননশীল প্রবন্ধের বিশ্লেষণ, দর্শন-মনস্তত্ত্ব-রাজনীতি-ইতিহাস-ধর্ম ইত্যাদি আলোচনা কিভাবে এবং কতোটা ঔপন্যাসিকেরা গ্রহণ করবেন তা স্থিরীকরণ ও প্রয়োগ সম্পূর্ণভাবে ঔপন্যাসিকের নিজস্ব শিল্পচেতনা, রুচি ও পরিমাণজ্ঞান উপর নির্ভরশীল। ঔপন্যাসিককে জানতে হবে - কোন্ পরিস্থিতিতে কোন্ উপাদান কতটুকু ব্যবহার উপযুক্ত হবে - তবেই তিনি সার্থক হতে পারবেন। উপন্যাসের এই সর্বগ্রাসিতার জন্যই তার যথার্থ স্বরূপ নির্ণয় করা একান্ত দুঃসাধ্য।

উপন্যাসকে কখনও কখনও কাব্য বলে ভ্রম জন্মায় (অনেকে বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা'কে কাব্য আখ্যা দিয়ে থাকেন), নাটকীয় সংঘাতপূর্ণ হলে নাটক বলেও তাকে মনে হতে পারে। কিন্তু উপন্যাস কাব্য নয়, নাটকও নয়, (দ্বন্দ্ব নাটকের প্রাণ। এ দ্বন্দ্ব ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত দুরূপ। ঔপন্যাসিক তাঁর অভিজ্ঞতায় যে দ্বন্দ্বের সাক্ষাৎ পান তাকে তিনি উপেক্ষা করতে পারেন না। অনেকেই বলেন, নাটকীয় পদ্ধতি ছাড়া দ্বন্দ্বময় জীবনচিত্র প্রকাশ করা অসম্ভব। কিন্তু মনে রাখা দরকার, পদ্ধতিগত পার্থক্য ছাড়াও উপন্যাস ও নাটকের মধ্যে মৌলিক কিছু পার্থক্য আছে।)৩৪ ধর্ম-দর্শন-মনস্তত্ত্ব-ইতিহাস কোনোটাই নয়।

এদের কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণভাবে আত্মস্থ(স্বীকরণ) করেও উপন্যাস উপন্যাসই যার মধ্যে মানুষের জীবন কাহিনীর আশ্রয়ে লেখকের জীবনধারণা ও লব্ধ অভিজ্ঞতার সুস্পষ্ট প্রকাশ ঘটে। ঔপন্যাসিক এরূপ জীবন-সম্পর্কিত ভাব-ভাবনার প্রকাশ মাধ্যম হিসেবে কতকগুলি সাধারণ উপাদানের আশ্রয় নিয়ে থাকেন। সে সব বহিরঙ্গ উপাদান বিচারের মধ্য দিয়েই উপন্যাসের সাধারণ সুরূপবৈশিষ্ট্যের সন্ধান করতে হয়।

শ্রেণীভেদের বিচারে শুধু নয়, যুগের রুচি-প্রবণতার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে উপন্যাসের আঙ্গিক কৌশল তথা গঠনপ্রণালী এবং বক্তব্যে যথেষ্ট রূপান্তর লক্ষ্য করা গেছে। কিন্তু সাধারণ বৈশিষ্ট্য বা উপাদান-লক্ষণ অপরিবর্তিত থেকেছে। দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্যহেতু সমকালীন ও সমশক্তিসম্পন্ন ঔপন্যাসিকদের মধ্যেও উপাদান-বিশেষের প্রতি আপেক্ষিক গুরুত্ব ও প্রাধান্যের স্বীকৃতি প্রদান এবং বাদানুবাদ ও বিতর্কের সৃষ্টি উপন্যাসের শিল্পরীতিতে জটিলতা আমদানি করেছে। কিন্তু মোটের উপর যে যে বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত হয়ে উপন্যাস বিশেষ শিল্প তা তাঁদের সমালোচনাতেও সর্বদা স্বীকৃত।

উপন্যাসের সাধারণ বৈশিষ্ট্যকে মোটামুটি দু'দিক থেকে দেখা যেতে পারে। এক, বহিরঙ্গ বৈশিষ্ট্য - যাকে বলা যায় উপন্যাসের বাহ্য লক্ষণ; দুই, অন্তরঙ্গ বৈশিষ্ট্য বা চারিত্র লক্ষণ। ই.এম. ফর্স্টার তাঁর 'Aspects of the novel' গ্রন্থে বলেছেন -"…. the aspects selected for discussion are seven in number; The story, people, the plot, Fantasy, prophecy, pattern and Rhythm."

অর্থাৎ বহিরঙ্গ-অন্তরঙ্গ মিলিয়ে তিনি মোট সাতটি অপরিহার্য লক্ষণ বা উপাদানের কথা বলেছেন, যাদের উপর উপন্যাসের নির্মাণ নির্ভরশীল। তবে মোটের উপর তিনি জোর দিয়েছেন বহিরঙ্গ লক্ষণের প্রতিই। নিছক কৌতূহল মেটাতে কার্যকারণ সম্পর্কহীন কাহিনীকে তিনি বলেছেন 'স্টোরি', সে স্টোরি কার্যকারণ পরম্পরায় গ্রথিত হলে বলা হবে 'প্লট'। বলা বাহুল্য, বর্তমানে উপন্যাসের কায়া নির্মাণে প্লটই ঈপ্সিত বস্তু, নিছক কাহিনী বা স্টোরি নয়। কোনও দেশেই প্রথম যুগের উপন্যাসে প্লটের অস্তিত্ব ছিলোনা। জীবনের রূপ জটিল থেকে জটিলতর হওয়ায় এবং মানুষের মনে কৌতূহলের পরিবর্তে জিজ্ঞাসা ও বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা

উদ্রিক্ত হওয়ায় উদ্ভূত রোমাঞ্চশক্তির চাহিদা মেটাতে সমস্ত সরল কাহিনী বাঁকা পথ ধরে প্লটের মাঝে বিলীন হয়েছে ।

ফর্স্টার বর্ণিত অপর উপাদান - মানুষ অর্থাৎ চরিত্র । উপন্যাসের মূল যে কাহিনী তা নির্মিত হয় বস্তুত কতকগুলি নরনারীর জীবনের উপর নির্ভর করেই । সাধারণ নরনারীর ব্যক্তিচরিত্র উপন্যাসের মধ্যেই অসাধারণ ও মহিমামণ্ডিত রূপলাভ করে । এ চরিত্র কখনো একক, কখনো বা অন্যান্য নানা ব্যক্তির সঙ্গে নানা প্রকারে জড়িত । ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির কিংবা সমাজের দ্বন্দ্বময় রূপ এবং তার ফল হিসেবে ব্যক্তির প্রতিক্রিয়া এবং আচরণ সৃষ্টি নির্মাণের মূল ভিত্তি । দৈনন্দিন জীবনে আমরা যে ব্যক্তিকে দেখি তার সঙ্গে বা বলা যায় ব্যক্তির বাহ্যরূপের সঙ্গে উপন্যাসে রূপায়িত ব্যক্তির পার্থক্য আছে । ব্যক্তির বাইরের আচার-আচরণ বা ব্যক্তিত্বের বহিঃপ্রকাশ দ্বারা আমাদের চতুষ্পার্শ্বস্থ ব্যক্তিদের জগত জানা যায়, সম্পূর্ণ নয় । কিন্তু শক্তিমান লেখক ব্যক্তির সম্পূর্ণ পরিচয় বা গোটা ব্যক্তিত্বকে পাঠকের সামনে তুলে ধরতে পারেন । একেবারে নিষ্প্রাণ জীবনযাত্রা নয়, নিরন্তর সংঘাতই উপন্যাসের প্রাণবস্তু এবং তা নরনারীর জীবনের কতকগুলি বহির্ঘটনা কিংবা দৈব প্রজাপতি ~~[illegible]~~ আকস্মিকতার মধ্যে কল্পনাহ করেনা, তা জটিল প্রাণবন্তে উদ্ভূত জটিলতর প্রক্রিয়া বিশেষ । সমষ্টিগত চেতনা থেকে যখনই ব্যষ্টিচেতনার উদ্ভব হল তখনই উপন্যাস বিস্তারিত হল ব্যক্তিমনের বিশদ রহস্য উদঘাটনের দুরূহ অধ্যায় । এখন চরিত্র চিত্রণ তাই মূলতঃ চরিত্রের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ ।

সুগ্রথিত আখ্যান কিংবা চরিত্র চিত্রণ - কোনোটাই এখন উপন্যাসের প্রধান বিষয় নয়, ফর্স্টার কথিত Fantasy, Prophecy, Pattern, Rhythm - এগুলিও নয় । এর মূল বৈশিষ্ট্য - লেখকের দৃষ্টিকোণ - তার জীবনদর্শন ও জীবনানুভূতির প্রকাশ । উপন্যাসের বহিরঙ্গ আকার - প্রকার সেই জীবনানুভূতি রূপায়ণ ও প্রকাশের মাধ্যম মাত্র - কবিকল্পনা, ছন্দস্পন্দ ইত্যাদি কখনও উপন্যাসের সাধারণ বৈশিষ্ট্য হতে পারেনা, কোনো কোনো উপন্যাসে এগুলির আপেক্ষিক প্রাধান্য সূচিত হতে পারে মাত্র । কল্পনা মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে বাস্তবতার সীমা লঙ্ঘিত হয় এবং উপন্যাসের মূল অর্থ ক্ষুণ্ণ হয় । ব্যক্তির দৈনন্দিন ক্রিয়াকলাপ বা রোজনামচায় ব্যক্তিত্বের বিকাশ বা মনের স্বরূপ কোনোটাই লক্ষিত হয়না । কল্পনার প্রয়োজন অস্বীকার করা যায়না ।

বাস্তবের মায়া সৃজনে লেখকের কল্পনাকুশলতা ও অন্তর্দৃষ্টি (inner sight) সর্বাধিক কার্যকরী শক্তি। শেক্সপীয়রের নাটকে যেমন কবিকল্পনার ছড়াছড়ি, ঠিক তেমনই উপন্যাসের মধ্যেও কাব্যময়তা ও সংকেতধর্মী উচ্চাঙ্গের রসমধুর ভাষার ব্যঞ্জনা নানাভাবে ছড়িয়ে থাকে।

উপন্যাসে লেখকের বিস্তৃত সামাজিক অভিজ্ঞতার রূপায়ণ ঘটবে বলে আমরা যা আশা করি সে অভিজ্ঞতা শুধু চোখে দেখা বাস্তব ঘটনাবলীর অভিজ্ঞতা নয়। কেবল প্রত্যক্ষ লব্ধ অভিজ্ঞতার বর্ণনা(দেখা বা শোনা) সাহিত্য না হয়ে সংবাদে পরিণত হয়। সংবাদ সাহিত্য নয়, উপন্যাস তো নয়ই। সংবাদ সাহিত্য হতে পারে তখনই যখন লেখকের সমৃদ্ধ ভাবকল্পনা তার মধ্যে যথার্থ রস সঞ্চার করতে সক্ষম হয়। ঘটনাকে দুর্ঘটনা বা পূর্বাপর বিচ্ছিন্ন দুরুল্লক্ষ্য ক্রিয়াকলাপ হিসেবে না দেখে তাকে প্রাকৃতিক বা মানবিক(উপন্যাসে অবশ্যই মানবিক ব্যাপারের অধিক গুরুত্ব) কোনো কার্যকারণ শৃঙ্খলার অঙ্গ হিসেবে দেখা হলে এবং তার সঙ্গে সম্পর্কিত নরনারীর চরিত্র রহস্য উদ্ঘাটিত হলে তা নিছক সংবাদ না হয়ে প্রকৃতপক্ষে উপন্যাসেরই বিষয় হয়ে থাকে।

দেহ আমাদের প্রত্যক্ষগোচর - তাকে যথাযথ চিত্রিত করা যায়। (রঙ তুলিতে এঁকে বা ফটোগ্রাফ করিয়ে। [illegible] জাতি-পাতি প্রভৃতির মাধ্যমে প্রতিমা নির্মাণ করেও সম্ভব)। কিন্তু একমাত্র দেহের আকৃতি স্বীকার করেই ব্যক্তিমানুষের পূর্ণ স্বরূপ অনুধাবন করা যায়না, আমাদের ক্রমিক অভিজ্ঞতায় তার আর একটি সত্তা ক্রমশঃ স্পষ্ট হতে থাকে। তা হল মন। দেহের মতো মন প্রত্যক্ষগোচর নয়। লেখকের জীবনানুভূতির প্রখরতায় বা প্রগাঢ়তায় তা প্রতিবিম্বিত হয়। তার বিশেষ আকার নেই, চরিত্রের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের মাধ্যমেই তার আসল প্রকৃতি বা স্বরূপ ধরা পড়ে। যেহেতু তার নির্দিষ্ট আকার নেই অতএব তাকে যে কোনো রূপে কল্পনা করা যায়। তবে সে কল্পনা অক্ষমশক্তিমান ঔপন্যাসিকের হাতে বিপরীত ব্যাখ্যায় পাঠকমনে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করতে পারে। চরিত্রের বাইরের আচরণ ও কার্যাবলীর পথ বেয়ে আমরা ব্যক্তিমনের গভীরে পৌঁছুতে পারি। এবং তার প্রতিক্রিয়ার প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে তার বাস্তব ব্যক্তিগত ও সামাজিক সম্পর্কের যথার্থ মূল্যায়ন করতে পারি। সুতরাং উপন্যাসের অন্যতম সাধারণ

বৈশিষ্ট্য যে বাস্তবধর্মিতা তা শুধু রূপগত বাস্তবতা বা সত্যানুকারিতা নয়, অন্তর্গত বাস্তবতা বা সত্যাতিরিক্ত কিছু। সামগ্রিক চরিত্র চিত্রণের মধ্য দিয়ে তার রূপায়ণ সম্ভবপর হতে পারে।

উপন্যাসের অন্যতম বৈশিষ্ট্য - সাধারণ মানুষের প্রতি আস্থা। আবির্ভাবের অব্যবহিত পর থেকেই উপন্যাস হয়ে উঠেছে অধিক পাঠকের মনোরঞ্জনকারী আপনজন। রেনেসাঁস-পূর্ব যুগে কাব্য-নাটকাদিতে এমন ব্যাপক আকারে সাধারণ মানুষের কথা বলা হয়নি। সে যুগে রাজা, জমিদার, উচ্চ পদাধিকারী অভিজাত ও রাজকর্মচারীগণ, বিখ্যাত ধনিক-বণিক সম্প্রদায়, সৈনিক-নায়ক প্রভৃতি সাহিত্যের বেদিমূলে স্থান জুড়ে ছিল। শিল্পবিপ্লবের পরিবর্তে আপন শক্তি ও পৌরুষে বিশ্বাস হয়তো রেনেসাঁস-পরবর্তী যুগে মধ্যবিত্তশ্রেণীর উদ্ভব ও প্রতিষ্ঠাকালে লেখকগণকে সাধারণ মানুষের কাছাকাছি এনে দাঁড় করিয়েছে এবং তারই ফলশ্রুতি উপন্যাসের বিস্তৃত পরিসরে ঔপন্যাসিকের মানুষের প্রতি অকৃত্রিম প্রীতি ও সহানুভূতির নিদর্শন ছড়িয়ে আছে। তাই উপন্যাসের উপজীব্য হয়ে উঠেছে জীবন-পিপাসার অকুণ্ঠ প্রকাশ - জীবনবিমুখতা বা নিবৃত্তিমার্গের কৃচ্ছ্রসাধনা নয়। এদিক থেকে উপন্যাসকে সর্বাধিক গণমুখী ও গণপ্রেমী সাহিত্য বলা যায়।[৩৭] কারণ চরিত্র সৃজন তথা জীবন বিশ্লেষণের জন্য ঔপন্যাসিক অসাধারণ নন শুধু অসাধারণ ব্যক্তির দ্বারস্থ হতে পারেন। অতি সাধারণ দীন হীন ব্যক্তিও যেন উপন্যাসের মুকুরে আত্মপ্রতিফলন খুঁজে পায়। সম্ভবত, এ কারণেই উপন্যাস আধুনিক কালে জনপ্রিয়তম সাহিত্য-শিল্প। বলা বাহুল্য, সাধারণ পাঠকের তুলনাতে ধনী হলেও অসাধারণ ব্যক্তিরাও আজ আর উপন্যাসকে দূরে ঠেলে রাখতে পারেন না। রাজার প্রাসাদ থেকে দরিদ্রের পর্ণকুটীর পর্যন্ত সর্বত্র এর গতি - অবাধ।

সর্বশেষ এবং বোধ করি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সাধারণ বৈশিষ্ট্য - সমস্যার অস্তিত্ব। প্রাগাধুনিক সাহিত্যে সমস্যার অস্তিত্ব ছিলো না বললেই হয়। আধুনিক জীবনের জটিলতা ও যুগ যন্ত্রণাবিদ্ধ মানুষ নানাপ্রকার সমস্যার দ্বারা জর্জরিত ও সর্বক্ষণ তার সমাধান প্রয়াসে লিপ্ত। সমস্যাকে এড়িয়ে যাওয়া নয়, তাকে মেনে নিয়ে, তাকে জয় করে আত্মরক্ষা ও প্রতিষ্ঠার প্রয়াস মানুষের মহিমাই ঘোষণা করেছে। সমালোচক বলেন -[৩৮] "..... আপন অন্তরের আলোতে লেখক কালকে নতুনভাবে ব্যাখ্যা করতে পারেন, ~~[illegible] কালের ঊর্ধ্বে উঠে কালকে~~

পারেন, কালের ঊর্ধ্বে উঠে কালকে সমালোচনা করতে পারেন, এবং কালকে অতিক্রম করে গিয়ে ভবিষ্যৎকে অনুমান করতে পারেন। লেখকের এই শক্তি আছে বলে আধুনিক উপন্যাসে একটি নতুন জিনিসের দেখা পাওয়া যায় - যার নাম সমস্যা। সমস্যা বলতে আমি সেই সব প্রশ্ন বুঝি, যার মধ্যে বিতর্ক বা পক্ষাবলম্বনের অবকাশ আছে। মধ্যযুগীয় কোনো কাহিনীতে সমস্যার অস্তিত্ব নেই, তবে মহাকাব্যে কিছু কিছু নৈতিক সমস্যার সাক্ষাৎ মেলে। আধুনিক উপন্যাসে নৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, আত্মিক নানা সমস্যা প্রাধান্য লাভ করেছে।" এই সূত্রে বলা যায়, সুনির্দিষ্ট দেশকালের ব্যবহার এবং জীবনের বাস্তবিকতার সন্ধান উপন্যাসের সঙ্গে অন্যান্য সাহিত্যরূপের পার্থক্য নিশ্চিতই সূচিত করে। ক্ষুদ্রবৃহৎ জীবনচিত্রের রসমধুর প্রকাশই উপন্যাসের অভীষ্ট। চরিত্র হবে দেশকালের বাসিন্দা; তার কালোচিত জীবনপিপাসা, তার পরিতৃপ্তির প্রয়াস এবং কালোত্তীর্ণ মহিমাবর্জনের পথে যাত্রা, এবং কাহিনীতে ধারাবাহিক কালের সুস্পষ্ট ছাপ উপন্যাসকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করে।

উপরিউক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলিতেও দেখা যায়। তাঁর রচনাগুলিতেই প্রথম যথার্থ আধুনিকতার সাক্ষাৎ পাওয়া গেলো। তাঁর উপন্যাসে গল্প আছে, আছে তার অমোঘ আকর্ষণ। একবার সে গল্পের যাদু-সরোবরে ডুব দিলে সেখান থেকে সহজে উঠে আসা যায়না। তাঁর 'দুর্গেশনন্দিনী' থেকে শেষ উপন্যাস 'সীতারাম' পর্যন্ত সর্বত্রই জমজমাট কাহিনীর সমাবেশ। শেষ পর্যায়ে বিশেষ করে 'ত্রয়ী' রচনাকালে পাত্রপাত্রীর কার্যকলাপের উদ্দেশ্যমূলকতা ও নীতি-আদর্শের বিশ্লেষিত মূল্যায়ন মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিল; তা সত্ত্বেও ধারাবাহিক গল্পের টানে পাঠকমন অনিবার্যরূপে আকৃষ্ট হয়েছে। সুনির্দিষ্ট দেশকালের ব্যবহার, বাস্তবময়তা, নাটকীয় সংঘাত, প্রাবন্ধিকের ন্যায় যুক্তিনিষ্ঠ বিশ্লেষণ, মনস্তত্ত্বের দু'একটি সূক্ষ্ম ইঙ্গিত, ঐতিহাসিক রসের অবতারণা প্রভৃতি তাঁর কাহিনীকে মহত্ত্ব দান করেছে।

শুধু কাহিনী হিসেবে নয়, প্লট হিসেবেও বঙ্কিমের উপন্যাস বিশিষ্ট। তাঁর পূর্ববর্তী কথাকাহিনীর ধারায় প্লটের বা সুগ্রথিত আখ্যানের অভাব ছিল। বেশির ভাগ কথাকারই সংবাদমূলক ধারাবাহিক কাহিনী বর্ণনায় নিষ্ঠাবন্ত ছিলেন। বঙ্কিমই প্রথম ঘটনা বর্ণনা বা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে কার্যকারণ সূত্রের সুষ্ঠু প্রয়োগ ঘটান। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর উদারতা ও ব্যাপকতা, বিজ্ঞানী ও দার্শনিকসুলভ অনুসন্ধিৎসা ও

ও জ্ঞানানুষণ জীবনের নানা উপলব্ধি ও আকস্মিকতার মধ্যেও পুরীশর সঙ্গতি ও সংযোগ আবিষ্কার করে। তাঁর কাহিনীতে প্লট এবং চরিত্রের নিবিড় যোগাযোগ লক্ষিত হয়। তাঁর অঙ্কিত চরিত্রগুলি বিশেষ কালের চিহ্ন ধারণ করেও সর্বকালের। ব্যক্তি ও সমাজের সংঘাতসংকুল পরিস্থিতি তাঁর চরিত্রগুলিকে মানবিক গুণে সমৃদ্ধ করেছে। দৈব-নির্ভরতার পরিবর্তে আপন পুরুষকারে আস্থা তাঁর নরনারীকে উজ্জ্বল ও ব্যক্তিত্বরূপে চিত্রিত করেছে। ব্যক্তিকে শুধু বাইরে থেকে প্রত্যক্ষ ক্রিয়াকলাপের মধ্যে না দেখে তাদের মন মানস সত্তাকে বঙ্কিম গুরুত্ব দিয়েছেন। তাই তাঁর চরিত্রগুলি রক্তমাংসের জীবন্ত মানুষরূপে পাঠকের চিত্তে সদা প্রতিষ্ঠিত।

একদা সাহিত্যের বিশাল অঙ্গনে আসর জমিয়েছিল উচ্চ বর্ণের রাজা-জমিদার, ধনী বণিক, পৌরাণিক ও লৌকিক দেব-দেবীরা। বঙ্কিম-পূর্ব উপন্যাসোপম গদ্যাত্মক কাহিনীতে স্থান পেয়েছিল ধনী-জমিদার, বাবু, পণ্ডিত-পুরোহিত-স্কুল মাস্টার, মোসাহেব, উকিল-এটর্নি-পাদরী প্রভৃতি ব্যক্তিগণ। সমাজের নীচুস্তরের সাধারণ লোক খুব কমই তাতে জায়গা পেয়েছে। এখানে আলাল ~~[illegible]~~ ছাড়া অন্যত্র তাদের সাক্ষাৎ মেলেনা। সম্ভবত সে কারণেই উপন্যাসের যথার্থ আবির্ভাব বিলম্বিত হয়েছে। হিন্দু-মুসলমান-~~[illegible]~~ ব্রাহ্ম-খ্রীষ্টান নানা ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে সমাজের নানাস্তরের বিচিত্র চরিত্রকে বঙ্কিম তাঁর উপন্যাসে স্থান দিয়েছেন। তবে তাঁকে এক্ষেত্রে পুরোপুরি সফল বলা যাবেনা। কারণ, তিনিও একেবারে সাধারণ কৃষক-শ্রমিককে তাঁর উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীরূপে উপস্থিত করতে পারেননি। তাঁ অবশ্য কী করতে পারেননি তা নিয়ে আক্ষেপ করা বৃথা, যা করেছেন তার মাপকাঠিতেই তাঁর মূল্যায়ন করতে হবে। সম্ভবত, উনিশ শতকে আমাদের দেশে নবোদ্ভূত মনস্তত্ত্বের সাথে মধ্যবিত্ত মানসিকতায় গণতান্ত্রিক ধ্যানধারণা ও মূল্যবোধ এবং লোকসাধারণের প্রতি বিশেষ দৃষ্টির কিঞ্চিৎ অভাব ছিল। বঙ্কিম নানা প্রবন্ধে 'হাসিম শেখ', 'রামা কৈবর্ত' প্রভৃতির কথা বললেও উপন্যাসে এদের বহুল আমদানি করতে পারেননি। দেখা গেছে, যে সাধারণ ব্যক্তিরা অসাধারণ হলে বঙ্কিম উপন্যাসে তাদের ঠাঁই মেলে সহজেই। (নবকুমার, তাঁর সহযাত্রী বৃদ্ধ, হীরা-দাসী, তারাচরণ, আনন্দমঠের সন্ন্যাসীরা, দরিয়া, নির্মলকুমারী, মানিকলাল, চন্দ্রশেখর, গুরগণ খাঁ, প্রফুল্ল, ভবানী পাঠক, রজনী-এ সকল চরিত্র সাধারণ হয়েও অসাধারণ)।

বঙ্কিমের উপন্যাস সমস্যাবহুল। কোথাও নরনারীর ব্যক্তিগত প্রেম-প্রণয় সমস্যা, কোথাও পারিবারিক শান্তি-শৃঙ্খলার সমস্যা, কোথাও দেশরক্ষা জাতিরক্ষা ও আত্মরক্ষার সমস্যা, কোথাও ধর্মনীতি-আদর্শ রক্ষার সমস্যা। কুটিল জটিল বা সরল যাই হোক, সাধারণভাবে তাঁর উপন্যাসগুলি সামাজিক-পারিবারিক, রাষ্ট্রনৈতিক বা ব্যক্তিগত কামনা-বাসনা, নীতি ও আদর্শগত নানা সমস্যায় আকীর্ণ হয়ে জটিল আকার নিয়েছে। এছাড়া, তাঁর পাত্রপাত্রীরা অনেকেই নানা আত্মিক সমস্যায় জর্জরিত। কারো কারো অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রায় আকাশচুম্বী। তাদের অন্তর্বিরোধ ও ঘাতপ্রতিঘাতের অভিব্যক্তি খুবই সুস্পষ্ট এবং তা আমাদের হৃদয়কে প্রবলভাবে নাড়া দিয়ে যায়।

সবশেষে বলা যায়, বিস্তৃত দেশকালের আধারে জীবনসমগ্র রূপায়ণ প্রয়াস বঙ্কিমের উপন্যাসগুলিকে বিশিষ্টতা দিয়েছে। তাঁর অঙ্কিত চরিত্র সমূহ একই সঙ্গে কালের প্রতিনিধিত্ব করেছেন এবং চিরকালীন সত্য ও আদর্শের অনুসরণের মাধ্যমে সাহিত্য সংসারে স্থায়ী আসন পেয়েছেন। সবচেয়ে বড় কথা, তাঁর উপন্যাসগুলির মধ্য দিয়ে কালানুক্রম অনুসারী ভাবের বিবর্তন লক্ষ্য করা যায়।

॥ উপন্যাসের শ্রেণী ভেদ ॥

বর্তমান অধ্যায়ের সর্বশেষ আলোচ্য উপন্যাসের শ্রেণীভেদ সম্পর্কিত সাধারণ উপস্থাপনা ও বঙ্কিম-উপন্যাসের শ্রেণীবিন্যাস। সাধারণভাবে উপন্যাসের শ্রেণীভেদ সম্পর্কে নানা মুনির নানা মত। বিভিন্ন তত্ত্ববিদ্ সমালোচক কিংবা অনুসন্ধানী ঔপন্যাসিক যেমন উপন্যাসের বিভিন্ন উপাদান এবং তাদের গুরুত্ব বিষয়ে নানাধরণের মত ব্যক্ত করেছেন, তেমনি উপাদানের আপেক্ষিক প্রাধান্য কিংবা গুরুত্বদানের ভিত্তিতেই উপন্যাসের শ্রেণীবিভাজনও করেছেন। কেউ বা গুরুত্ব দিয়েছেন কাহিনীগত দিক বা প্লটের উপর, কেউ বা চরিত্রের উপর, আবার কেউ বা সামগ্রিকভাবে গঠনগত রূপনির্মিতির উপর, এবং এরই ভিত্তিতে এক একজন এক এক প্রকার শ্রেণী বিভাগের সুপারিশ করেছেন। বস্তুতপক্ষে, বহিরঙ্গ রূপ বিচারের মাধ্যমে উপন্যাসের শ্রেণী বিভাজন করতে চাওয়া

বিড়ম্বনা ছাড়া কিছু নয় ।

~~[illegible]~~ যে সকল শিল্পী ও সমালোচক উপন্যাসের শ্রেণী নির্ণয় নিয়ে চিন্তাভাবনা করেছেন তাঁদের মতামতগুলির সাধারণীকরণ করলে দেখা যায় যে, উদ্ভবের কাল থেকে আজ পর্যন্ত উপন্যাস ও রোমান্স(Novel and Romance) - এই দু'টি শ্রেণীই প্রাধান্য পেয়ে আসছে । নভেল হলো সমকালীন বাস্তব ঘটনা ও চরিত্রভিত্তিক উপন্যাস এবং রোমান্স হলো কাল্পনিক অতীত বা ঐতিহাসিক ঘটনা ও চরিত্রভিত্তিক কাহিনী । মূলতঃ আখ্যায়িকায় কল্পনা ও বাস্তবের আপেক্ষিক প্রাধান্যের ভিত্তিতে এ ধরনের শ্রেণীভেদ করা হলেও কি চরিত্রচিত্রণ, কি লেখকের কাল চেতনা ও বিশেষ কালের ব্যবহারে তাঁর জীবনাভিজ্ঞতার রূপায়ন প্রভৃতি দিকের বিচার করেও এ প্রকার শ্রেণীভেদের যৌক্তিকতা স্বীকার করা যায় । প্রথম দিকে নভেল নামটাই ছিলোনা, তখন উপন্যাস অর্থে 'ফিকশন' শব্দ চালু ছিলো । ফলতঃ ফরাসী দেশে উপন্যাসের উদ্ভবের আদি পর্বে কল্পনাযুক্ত এবং বাস্তবতা দূরীন — উভয় প্রকার গদ্য আখ্যায়িকাই 'রোমান্স' নামে পরিচিত ছিলো । কিন্তু পরবর্তীকালে ধীরে ধীরে রোমান্স এবং উপন্যাস দু'টি ধারাই ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী হিসেবে ~~অস্তিত্ব~~ স্বীকৃতিলাভ করতে থাকে ।

সামগ্রিকভাবে ইংরেজি সাহিত্য সমালোচনা বা অংশতঃ উপন্যাসের আলোচনার ক্ষেত্রে [illegible] থেকে শুরু করে আধুনিক কাল পর্যন্ত নানান সময়কালীন যে সকল মতামত পাওয়া গেছে তাতে দেখা যায় রোমান্স ও নভেল ছাড়া অন্যও বহুবিধ নামে উপন্যাস শ্রেণীবিভাগ হয়েছে (এডুইন মুইর-এর শ্রেণীবিভাগ দ্রষ্টব্য) । বেশির ভাগ আলোচনা ও শ্রেণী বিন্যাস হয়েছে এর বিষয়বস্তুর ও উপাদান প্রাধান্যের ভিত্তিতেই । প্রথম দু'টি শ্রেণী সম্পর্কে সাধারণভাবে বলা হয়েছে, নভেল বা উপন্যাসে থাকে 'সমকালের ছাপ' আর রোমান্সে থাকে মানুষের চিরন্তন আবেগ, প্রবৃত্তি, উচ্ছাস, উল্লাস ও অলৌকিক স্বপ্নের রূপায়ন । মহাকাব্যে যেমন কাহিনী স্বর্গ-মর্ত-পাতাল প্রভৃতি অতিবিস্তৃত দেশে কালে ব্যাপ্ত হয়ে থাকে এবং চরিত্রগুলি বিশেষ বিশেষ গুণ বা আদর্শের বাহক হয়ে থাকে তেমনি রোমান্সেরও । আমাদের অভিজ্ঞতার কালের স্বর্গে সেখানে ঘটনার গতি সমতালে চলেনা । কিন্তু উপন্যাসের কাহিনী ও চরিত্র এর বিপরীত বিন্দুতে অবস্থান করে । নভেল-এর লেখক বাস্তব কালের গতির সঙ্গে এর ঘটনাগতির সমন্বয় সাধন করেন ।

হেনরি জেমস ঘটনাপ্রধান(Novel of action ~~and~~ ও incidents) কিংবা চরিত্রপ্রধান উপন্যাস(Novel of character) বলে কোনোপ্রকার শ্রেণীবিভাগ মানতে চাননি । তাঁর

বলে, ভালো উপন্যাস ও মন্দ উপন্যাসে - এ দুই ভাগেই শুধু উপন্যাসের শ্রেণী বিন্যাস করা উচিত। এডুইন মুইর তাঁর ('স্ট্রাকচার অব্ দি নভেল' structure of the Novel) গ্রন্থে স্থান ও কাল প্রয়োগের আপেক্ষিক গুরুত্বের মাপকাঠিতে উপন্যাস বিচারে শ্রেণীভেদের পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। এভাবেই তিনি উপন্যাসের পাঁচটি গঠনগত শ্রেণীর কথা বলেছেন। এগুলি হলো যথাক্রমে - কার্য বা ঘটনাপ্রধান, চরিত্রপ্রধান, নাট্যধর্মী, ইতিবৃত্তমূলক ও বিশেষ কাল বা যুগপ্রধান উপন্যাস। রেনে ওয়েলেক ও অস্টিন ওয়ারেন তাঁদের ('থিয়োরী অব্ লিটারেচার' Theory of Literature.) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে অষ্টাদশ শতাব্দীতে গদ্য আখ্যানের (ফিকশন) দুটি শ্রেণী বা প্রজাতি (species) ছিলো - নভেল ও রোমান্স। তাঁরা আরও বলেছেন - বর্তমানে উপন্যাসকে এত বেশি ভাগে বিভক্ত করে দেখানো হচ্ছে যে শুধুমাত্র কালের বিচারে এ প্রকার শ্রেণীবিভাজন সম্পন্ন হয় বলে উপন্যাসের মূলধর্ম উপেক্ষিত ও গুরুত্বহীন হয়ে পড়ছে।

ঐতিহাসিক ও সামাজিক উপন্যাস ছাড়াও বিশেষ সমালোচকদের দৃষ্টিভঙ্গীতে বিভক্ত নানা ধরণের উপন্যাসের কথা আমরা ~~শুনি~~ শুনে থাকি; যেমন, তেভাগা আন্দোলনের উপন্যাস, শিশু চরিত্র রূপায়ণের উপন্যাস, নাবিকজীবন নিয়ে উপন্যাস বা সামুদ্রিক উপন্যাস ইত্যাদি। এর কারণ আর কিছুই নয়, "genre in the nineteenth century and in our own time suffers from the same difficulty as 'period': we are conscious of the quick changes in literary fashion - a new literary generation every ten years, rather than every fifty years." ৬১

সে যাই হোক, উপরিউক্ত বিভাগগুলি ছাড়াও আঞ্চলিক উপন্যাস, মনস্তাত্ত্বিক ও চেতনাপ্রবাহধর্মী উপন্যাস, রম্যোপন্যাস, আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস, ভ্রমণোপন্যাস ইত্যাদি নানাধরণের নামকরণের মাধ্যমে উপন্যাসের বিভাজন লক্ষ্য করি।

উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা উপন্যাসের উদ্ভবের যুগেও কাহিনীতে মূলত বাস্তবতা ও কল্পনার আপেক্ষিক প্রাধান্যের ভিত্তিতে উপন্যাসের শ্রেণীবিভাগ করা হয়। যতদূর জানা যায়, প্যারীচাঁদ মিত্রই প্রথম লেখক যিনি তাঁর রচনা 'আলালের ঘরের

দুলাল'কে "Original Novel in Bengali being the first work of the kind" বলে দাবি করেছেন। তাঁর পূর্বে রচিত কথাসাহিত্য থেকে তাঁর রচনার পার্থক্য সম্পর্কে তিনি খুবই সচেতন ছিলেন এবং বলার প্রয়াস পেয়েছেন যে, সমকালীন "Condition of the Hindu society, manners, customs" ইত্যাদির প্রকাশে আলাল প্রথম বাংলা মৌলিক 'নভেল'। বঙ্কিমচন্দ্রের মতামত বিশ্লেষণ করেও দেখা যায় যে তিনিও গদ্য আখ্যায়িকার (উপন্যাসের - কারণ ছোটোগল্পের উদ্ভব তখনও হয়নি) ধারায় নানাশ্রেণীর অস্তিত্বসম্পর্কে অবহিত ছিলেন। বঙ্কিমযুগের বিখ্যাত সমালোচক চন্দ্রনাথ বসু 'কথাগ্রন্থের' দু'প্রকার শ্রেণীর নির্দেশ করেছেন। এগুলি যথাক্রমে রোমান্স ও প্রকৃত ঘটনামূলক। বলাবাহুল্য, প্রকৃত ঘটনামূলক কথাগ্রন্থই এখন 'সামাজিক-পারিবারিক উপন্যাস' নামে পরিচিতি লাভ করেছে। চন্দ্রনাথ বসু 'নবেল বা কথাগ্রন্থের উদ্দেশ্য' প্রবন্ধে (১২৮৭) স্পষ্ট করেই বলেছেন -"কথাগ্রন্থ প্রধানতঃ দুই প্রকারের। প্রথম প্রকারের নাম ইংরাজিতে রোমান্স। ইহা কল্পনাপ্রধান। ....বাংলায় দুর্গেশনন্দিনী, কবীশিষ্য/ পরাজয়, শকুন্তলা প্রভৃতি কথাগ্রন্থগুলি এই শ্রেণীভুক্ত। দ্বিতীয় প্রকারের কথাগ্রন্থ প্রকৃত ঘটনা অবলম্বনে রচিত হয়। .... বিষবৃক্ষ, কৃষ্ণকান্তের উইল, স্বর্ণলতা প্রভৃতি গ্রন্থগুলি এই শ্রেণীভুক্ত।"[৪০]

রোমান্স বিভক্ত হয়েছে মোটামুটি তিনভাগে - মুখ্যতঃ ঐতিহাসিক উপন্যাস ও ঐতিহাসিক রোমান্স নামে এবং গৌণতঃ সামাজিক রোমান্স নামে। বস্তুত, প্রথম যুগের সামাজিক উপন্যাসেই শুধু নয়, পরেও এগুলির মধ্যে (ঐতিহাসিক বা রোমান্টিক উপন্যাসের গণ্ডি ছাড়িয়ে) রোমান্স রসের স্ফুরণ ঘটেছে। কিন্তু সময়ের বাস্তবতার ধারণায় পরিবর্তন এবং অভিজ্ঞতার পরিধির সম্প্রসারণের ফলে উপন্যাসের স্রোত বহুদূর প্রসারিত হয়েছে এবং অভূতপূর্ব পরীক্ষা পেয়েছে। নানা ধরণের উপন্যাসে বাংলা সাহিত্যের আসর এখন জমজমাট। রাজনৈতিক উপন্যাস, আঞ্চলিক উপন্যাস, ভ্রমণোপন্যাস, রোমাঞ্চকর রহস্য উপন্যাস, মনস্তাত্ত্বিক ও চেতনাপ্রবাহ উপন্যাস, আত্মজৈবনিক উপন্যাস ইত্যাদিতে বাংলা উপন্যাসের ধারা দুর্দম বেগবতী। তবে বাংলা উপন্যাসের মূলতঃ দু'টিই শ্রেণী : 'রোমান্স' বা রোমান্টিক ~~উপন্যাস~~ (ঐতিহাসিক) উপন্যাস এবং 'নভেল' বা সামাজিক উপন্যাস।

উপন্যাসের কেন এই শ্রেণীবিভাগ ? (উপন্যাস সমালোচক Douglas Hewitt)-এর মতে সায় দিয়ে অনেকে বলতে পারেন - উপন্যাসের শ্রেণীবিভাগের কোনও প্রয়োজন নেই, উপন্যাস শুধু উপন্যাস । কথাটা যে একেবারে অযৌক্তিক তা নয় । একথা অবশ্য স্বীকার্য যে, উপন্যাস পাঠকালে পূর্ব হতে শ্রেণীধারণা থাকলে পাঠক পরিচয় জনিত আনন্দ লাভ করতে পারেন কিন্তু অচেনাকে চেনা, অজানাকে জানার আনন্দ (অনির্বচনীয় রসাস্বাদ) থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হবেন । তাছাড়া, অসংখ্য শ্রেণীর মধ্যে পড়ে পাঠকের দিশেহারা হবার সমূহ সম্ভাবনা । দুটি উপন্যাসের কোনো জাত নেই । কাহিনী, চরিত্র, পরিবেশ - পরিস্থিতি ইত্যাদি যেমন ভিন্ন ভিন্ন এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ হয়ে থাকে, তেমনি পাঠকমনেও এগুলি ভিন্ন ধরণের অনুভূতি সঞ্চার করে এবং বিচিত্র রসের যোগান দেয় । উপন্যাসের সার্থকতা নির্ভর করে ~~এবং~~ তার রসসৃষ্টি ও পাঠক হৃদয়ে তা সঞ্চারিত করার ক্ষমতার উপরে । সুতরাং আগে থেকে কোনো বিশেষ ধারণা পোষণ করলে পূর্ব পরিচয়জনিত একঘেয়েমি আসাও অসম্ভব নয় । তাছাড়া, শ্রেণীবিভাগ অনেক সময়ই সুষ্ঠু হয়না এবং একই উপন্যাসে বিভিন্ন শ্রেণীর লক্ষণের মিশ্রণ ঘটাও সম্ভব । আর উপন্যাসের ত্রুটিপূর্ণ শ্রেণীনির্ণয় পাঠককে বিভ্রান্ত করতে পারে । কিন্তু এতৎসত্ত্বেও অনেক সমালোচকই উক্ত প্রকার শ্রেণীবিভাজন করতে প্রবৃত্ত হয়েছেন । অবশ্য এটাই শেষ কথা নয় । শ্রেণীভেদের প্রয়োজনীয়তাকে একেবারে অস্বীকার করা যায়না । এধরণের শ্রেণীবিভাগে লেখকের উদ্দেশ্য ও মানসপ্রবণতা বোঝা সম্ভব হয় এবং তার Pattern ও Rhythm সম্পর্কে পূর্ব ধারণায় পাঠক তাঁর মনকে প্রস্তুত করে নিতে পারেন / এবং সেই ধারণার ভিত্তিতে তার বিচার বিশ্লেষণও করতে পারেন । সুতরাং শ্রেণীবিভাজন রসগ্রহণের বাধা না হয়ে বরং সহায়ক হয়ে থাকে । উপন্যাসেই শুধু নয়, সাহিত্যের অন্যান্য সকল শাখাতেই শ্রেণীবিভাজন লক্ষ্য করা যায় । বাস্তবিকই,

"Theory of genres is a principle of order : it classifies literature and literary history not by time or place(Period or national language)but by specifically literary types of organisation or structure."

রসগ্রহণ কিংবা আলোচনা ও আধুনিক মূল্যায়নের সুবিধার জন্য শ্রেণীবিভাগ স্বীকৃত হয়ে থাকে ।

আগেই বলা হয়েছে, গদ্য আখ্যায়িকার নানা শ্রেণী সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র অবহিত ছিলেন । তিনি শুধু ঔপন্যাসিক ছিলেন না, একাধারে ঔপন্যাসিক - প্রাবন্ধিক ছিলেন । Bengali literature প্রবন্ধে প্যারীচাঁদের গ্রন্থের সমালোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন, - আলাল "......may be said to be the first ~~xxxxxxxx~~ novel in Bengali language".[৪২] নভেল যে বাস্তবজীবনের আলেখ্য এ সম্বন্ধে তাঁর স্পষ্ট ধারণা ছিল । শুধু তাই নয়, তিনি রোমান্সের লেখক হিসেবে প্রতাপচন্দ্র ঘোষ ও নিজেকে চিহ্নিত করেছেন । এ থেকে ধারণা করা সম্ভব যে, নভেল ও রোমান্সের মূলনীতিগত বিষয়বস্তুর পার্থক্য সম্বন্ধে তিনি সচেতন ছিলেন এবং সেজন্যেই রোমান্সের বর্ণাঢ্য পথে পা বাড়িয়েছিলেন ।

পরবর্তীকালে উপন্যাসের আর একটি শ্রেণীর কথা তিনি বলেছিলেন, তাহলো 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' । ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'রাজসিংহ' উপন্যাসের চতুর্থ সংস্করণের (পরিবর্ধিত) বিজ্ঞাপনে তিনি বলেছেন - "আমি পূর্বে কখনো ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখি নাই । দুর্গেশনন্দিনী বা চন্দ্রশেখর বা সীতারামকে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলা যাইতে পারেনা । এই প্রথম ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখিলাম । এ পর্যন্ত ঐতিহাসিক উপন্যাস প্রণয়নে কোন লেখকই সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য হইতে পারেন নাই । আমি যে পারি নাই, তাহা বলা বাহুল্য ।"[৪৩] ইতোমধ্যে রমেশচন্দ্র দত্তের ঐতিহাসিক উপন্যাসাবলীও প্রকাশিত হয়েছিলো । তিনিও যে এ ব্যাপারে বিশেষ সফল হননি, বঙ্কিম প্রকারান্তরে তারও স্বীকৃতি দিয়েছেন । তিনি তাঁর দুর্গেশনন্দিনীকে প্রথমে 'ইতিবৃত্তমূলক উপন্যাস' নামে চিহ্নিত করেছিলেন - যদিও ঐতিহাসিক উপন্যাস বলেননি, কিন্তু তথাপি পরে তাঁর এমত পরিবর্তিত হয়েছিলো । তিনি নিশ্চয়ই ভেবেছিলেন - ঐতিহাসিক উপন্যাস লেখকের দায়িত্ব পালন করা অত সহজে সম্ভব হতে পারেনা । শুধু প্রেক্ষাপটে অতীত কাল অবলম্বিত হলেও রোমান্টিক প্রণয়-প্রধান 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' অভিধা পেতে পারেনা, এমনকি 'ইতিবৃত্তমূলক উপন্যাস' নামও নয় । 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' একটা বিশেষ শ্রেণী এবং এর বৈশিষ্ট্য অনেকটা প্রকরণগত - বঙ্কিমচন্দ্রের এরূপ ধারণা

অবশ্যই ছিলো ।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের দৌলতে একথা আমাদের জানা যে, ইতিহাসের সংযোগে উপন্যাসে বিশেষ রস সঞ্চারিত হয় এবং ঔপন্যাসিক ইতিহাসের সত্যের মর্যাদা ও গুরুত্ব স্বীকার না করলেও তার রসের প্রতি লোভ সংবরণ করতে পারেন না । সাহিত্যের নিত্য সত্য ও ইতিহাসের বিশেষ সত্য - এ দুয়ের মধ্যে বিরোধ ঘটলে ঔপন্যাসিক কার পথ অবলম্বন করবেন ? উপন্যাসের মধ্যে ইতিহাসের প্রসঙ্গ যেভাবেই আসুক না কেন ঐতিহাসিক রসের অবতারণায় সফল হলেই[৪৪] উপন্যাসটি 'ঐতিহাসিক' অভিধা পাবার যোগ্য বলে বিবেচিত হবে । এ দৃষ্টিভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতে মনে হওয়া খুবই স্বাভাবিক যে, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও উপন্যাসের শ্রেণীভেদ ও ঐতিহাসিক উপন্যাসের অস্তিত্ব সম্পর্কে দ্বিধাহীন ছিলেন । বাংলা সাহিত্যের প্রবীণতম ঐতিহাসিক ডঃ সুকুমার সেনও উপন্যাসের শ্রেণীতে ঐতিহাসিক উপন্যাসের বিশেষত্ব অবস্থান সম্পর্কে মত প্রকাশ করেছেন ।[৪৫] তিনি বলেছেন - "কল্পনাকে সুনির্দিষ্ট দেশকালের আধারে (আধুনিক বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় স্পেস-টাইম-কনটেক্সটে) পরিবেশিত হলেই উপন্যাসকে বলব ঐতিহাসিক, তা না হলে নয় ।"[৪৬] সুতরাং দেখা যাচ্ছে, উপন্যাসের শ্রেণীভেদ স্বীকার করে নিলে 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' ও সহজেই স্বীকৃতি পাবার যোগ্য ।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর নিজের লেখা কোনো কোনো উপন্যাসকে বিশেষ বিশেষ শ্রেণীভুক্ত করে দেখাতে দ্বিধাহীন ছিলেন পরিচয় দিলেও তাঁর দিক থেকে দ্বিধাবোধ বা সংশয় একেবারে ছিলোনা - এমন কথা বলা যাবেনা । মনে হয়, এ কারণেই তিনি তাঁর কতকগুলি উপন্যাসকে কোনো শ্রেণীভুক্ত করেননি । আবার নির্দ্বিধায় অন্যদিকে বিশেষ শ্রেণীর পর্যায়ভুক্ত করে দেখাতে পারিনা । 'আনন্দমঠের' তৃতীয় বারের (প্রথমবার লিখিত) বিজ্ঞাপনে দেখি -" ..... দুইটি ঘটনা সম্বন্ধে উপন্যাসে ও ইতিহাসে বিশেষ অনৈক্য আছে । .... এ অনৈক্য আমি গুরুতর বিবেচনা করিনা - কেননা, উপন্যাস উপন্যাস, ইতিহাস নহে ।" তাঁর জীবিতকালে 'রাজসিংহে'র শেষ সংস্করণের বিজ্ঞাপনে(১৮৯৩) তিনি লিখেছেন - "উপন্যাসে সকল কথা ঐতিহাসিক হইবার প্রয়োজন নাই ।" ১৮৯১ সালে 'দেবী চৌধুরাণী'র বিজ্ঞাপনে তিনি বলেছেন - " ..... পাঠক মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক আনন্দমঠকে বা দেবী চৌধুরাণীকে 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' বিবেচনা না করিলে বড় বাধিত হইব ।" স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে

- এ উপন্যাসগুলিকে তবে কোন্ শ্রেণীতে গণ্য করা যবে ?

বঙ্কিম-মানস ছিল আজীবন রোমান্টিক কল্পনাপ্রবণ । রোমান্টিক কবি - প্রাণতার অন্যতম লক্ষণ বর্তমানের কঠোর বাস্তব পরিস্থিতির হাত থেকে সুদূরে পলায়ন করবার মনোবৃত্তি অর্থাৎ যা আছে বা পাওয়া যাচ্ছে, তাতেই চাওয়ার মধ্যে তার অসমীচির মনে চিরকালীন অতৃপ্তি । রোমান্টিকতা তাই বিশেষ দেশ-কালের গণ্ডীতে আবদ্ধ থাকেনা, স্থান-কালের সীমানা ছাড়িয়ে যাওয়াতেই তার প্রকৃত স্ফূর্তি । রোমান্টিকতাকে বলতে পারি একপ্রকার মানসিকতা । তার অবলম্বন 'রোমান্স' । রোমান্টিক আন্দোলনের মূলে ছিল সর্বপ্রকার বন্ধন থেকে মুক্তির কামনা । এটা আবেগের, অতীত প্রেমের প্রতীক, সমকালীন বস্তুজগৎ থেকে লব্ধ একটা অতৃপ্তি এবং তা থেকে উদ্ভূত একটা আদর্শ জগতে পলায়নের আকাঙ্ক্ষা । আদর্শ জগতের জন্য অন্তহীন যাত্রা এবং কামনার সফল বাস্তব রূপায়ন নির্ভর করে কল্পনাশক্তির গভীরতা ও ব্যাপকতার উপর। বঙ্কিমের চিন্তক পণ্ডিতের মুখিয়ে ছিলো একটি চির অতৃপ্ত, সুদূরের পিয়াসী কবি-আত্মা । ফলে তাঁর সমগ্র লেখক-জীবনে রূপ থেকে রূপান্তরে, বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে বারবার দিক্ পরিবর্তন করা যায় । অতৃপ্ত হৃদয় পিপাসার তাড়না তাঁকে কখনো স্থির হতে দেয়নি ।

বাল্যকালেই তিনি সংবাদ-প্রভাকর সম্পাদক কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন । ১৮৫৬ সালে তার প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'ললিতা - পুরাকালিক গল্প ও মানস'[56] প্রকাশিত হয় । এ গ্রন্থ তিনি রচনা করেছিলেন প্রকাশকালের অন্তত প্রায় বছর তিনেক আগে ১৮৫৩ সালে । ১৮৫৬ সাল পর্যন্ত হুগলী কলেজে পাঠকালে তিনি অনেক কবিতা লিখেছিলেন । এসব থেকে তাঁর ভাবপ্রবণ মনের পরিচয় পাওয়া যায় । তাছাড়া, তাঁর ইংরেজি ভাষায় লিখিত গদ্য রচনা 'রাজমোহনস ওয়াইফ' রীতিমত রোমান্টিক আখ্যান । তাঁর এ প্রকার রোমান্টিক কল্পনাপ্রবণ কবি-প্রাণতা সর্বদাই সক্রিয় ছিলো । তাঁর সাহিত্য জীবনের প্রায় মাঝামাঝি কালে রচিত তাঁর সামাজিক(কোনও কোনও সমালোচক বলেন যে, বঙ্কিমের উপন্যাসগুলির মধ্যে সামাজিক উপন্যাস নেই, যা আছে তা সবই পারিবারিক উপন্যাস) আখ্যানের মধ্যেও প্রচুর পরিমাণে রোমান্টিক উপাদান ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল । সেদিক থেকে বিচার করলে তাঁর সকল কথা-কাহিনীমূলক রচনাই রোমান্স বা রোমান্টিক আখ্যায়িকা অভিধা পেতে পারে । রোমান্সধর্মিতা সত্ত্বেও

বঙ্কিম তাঁর উপন্যাসে ,শ্রেণী যাই হোক্ না কেন বাস্তবধর্মিতা রক্ষা করেছেন । বিশেষ দেশকালের সীমানায় তাঁর কাহিনী ও চরিত্র স্থাপন করেছেন বলেই তাঁর উপন্যাস বাস্তবধর্মী । রোমান্স হলেই বাস্তবধর্ম ক্ষুন্ন হয়না । কল্পনার আতিশয্যে কালের চিহ্ন মুছে গেলে তবেই অবাস্তব হয় । পূর্বতন সাহিত্যের রোমান্সধর্মিতা কালহীনতারই নামান্তর । কাল সম্পর্কে যথার্থ চেতনার অভাব বাস্তবতার পরিপন্থী । সমকালের আধারে স্থাপিত হলেও তার মধ্যে রোমান্স থাকতে পারে ।

বিভিন্ন সমালোচক বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের নানা প্রকার শ্রেণীবিভাগ করেছেন । বাংলা উপন্যাসের ঐতিহাসিক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' (৫ম সং-১৩৭২) গ্রন্থে বলেছেন - ''বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলি মোটামুটি দুইভাগে বিভক্ত - একশ্রেণী সম্পূর্ণ বাস্তব, সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের বর্ণনা ও সমস্যাই তাহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য । দ্বিতীয় শ্রেণী ঐতিহাসিক বা অসাধারণ ঘটনাবলীর উপরে প্রতিষ্ঠিত । অর্থাৎ উপন্যাসের 'Novel' ও 'Romance' বলিয়া যে দুইটী প্রধান বিভাগ আছে, বঙ্কিমের উপন্যাসেও সেই দুইটী বিভাগ বর্তমান ।'' (পৃ.-৩৪) । অন্যত্র তিনিই আবার বলেছেন, - ''ঐতিহাসিকতার দিক দিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলিকে মোট চারটি শ্রেণীবিভাগ করা যায় । (১) যে সমস্ত উপন্যাসে ঐতিহাসিক সত্যনিষ্ঠা ও পারিপার্শ্বিকের চিত্র অধিকতর স্ফুট—'দুর্গেশনন্দিনী', 'চন্দ্রশেখর' ও 'রাজসিংহ' এই তিনখানি উপন্যাস এই পর্যায়ভুক্ত বলিয়া মনে করা যাইতে পারে ।.... (২) দ্বিতীয় শ্রেণীর উপন্যাসে ইতিহাস কল্পনার স্বর্ণ রশ্মিতে রঞ্জিত হইয়া নিজ সত্যরূপ বিসর্জন দিয়াছে, ভাবপ্রবণতা ও আদর্শবাদের সঙ্গে একাকার হইয়া গিয়াছে । 'আনন্দমঠ' এই শ্রেণীর একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত । (৩) তৃতীয় শ্রেণীর উপন্যাসে ইতিহাস নিতান্তই ক্ষীণ ও অসম্পূর্ণভাবে মূল আখ্যায়িকার সঙ্গে গ্রথিত হইয়াছে । এই শ্রেণীর উপন্যাসে ইতিহাস কেবল ঘটনা বৈচিত্র্যের কারণরূপে পরিকল্পিত হইয়াছে, কোন উচ্চতর কলা-কুশলতার প্রয়োজনে নিযুক্ত হয় নাই ।'' দৃষ্টান্ত 'মৃণালিনী' । (৪) 'সীতারাম' বা 'দেবী চৌধুরাণী' খাঁটি পারিবারিক উপন্যাস ।'' ''কপালকুণ্ডলা'তেও রোমান্সের অনুরূপ মাত্রায় পশ্চাদপট ইতিহাস নিতান্তই ক্ষীণ ও নিষ্প্রয়োজন বলিয়াই বোধ হয় ।'' (ঐ, পৃ.-৪৩-৪৬) । বলা বাহুল্য, এখানে উদ্ধৃতিতে বঙ্কিমের সবগুলি উপন্যাসেরই পর্যায়ভুক্তি দেখানো হয়নি । পূর্বের উদ্ধৃতিতে 'রোমান্স' বলে যাদের নির্দেশ করতে

ছাড়া রয়েছে অর্থাৎ ইতিহাসের সঙ্গে সংযোগ আছে শুধু এমন উপন্যাসেরই বর্গীকরণ এস্থলে দেখানো হয়েছে। রোমান্সের একটি বিভাগের মধ্যেই উপবিভাগের কত বৈচিত্র্য দেখা যায়।

অচ্যুত গোস্বামী তাঁর 'বাংলা উপন্যাসের ধারা'তে বলেছেন - "বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসকে দু - ভাগে ভাগ করা চলে। ঐতিহাসিক কালের সমাজভিত্তিক উপন্যাস এবং বর্তমান কালের সমাজভিত্তিক উপন্যাস। এইভাবে ভাগ করার তাৎপর্য এই যে, সাধারণতঃ ঐতিহাসিক ও সামাজিক উপন্যাসের মধ্যে যে মৌলিক পার্থক্য আছে বলে মনে করি, অন্ততঃ বঙ্কিমযুগের অন্যান্য লেখক কর্তৃক রচিত এই দু-জাতের উপন্যাসে যে মৌলিক পার্থক্য দেখা যায়, বঙ্কিমের সাহিত্যে তা প্রায় অনুপস্থিত।"
ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন - "বঙ্কিমচন্দ্রের সব উপন্যাসই রোমান্স শ্রেণীর, কাহিনী ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে সঙ্কলিত হোক অথবা জনশ্রুতি-বার্তার সঞ্চার হইতে আহৃত হোক।" একটু পরে তিনিই আবার বলেছেন -"বিষয়বস্তু প্রভৃতি আর রোমান্স রসের পরিমাণ অনুসারে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলিকে তিনভাগে ফেলা যায়। এক, রসপ্রধান ও বিশুদ্ধ রোমান্টিক। যেমন দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী, ইন্দিরা, যুগলাঙ্গুরীয়, রাধারাণী ও রাজসিংহ। .... দুই, নীতিপ্রধান ও গার্হস্থ্য রোমান্স। যেমন বিষবৃক্ষ, কৃষ্ণকান্তের-উইল, চন্দ্রশেখর এবং রজনী। তিন, নীতিপ্রধান ও 'গীতোক্ত' ধর্মাদর্শমূলক রোমান্স। যেমন আনন্দমঠ, দেবী-চৌধুরাণী এবং সীতারাম।"[১৬]

প্রফুল্ল কুমার দাশগুপ্ত তাঁর 'উপন্যাস সাহিত্যে বঙ্কিম' গ্রন্থে বলেছেন যে, বঙ্কিমের উপন্যাসগুলিকে পাঁচটি শ্রেণীতে বিভক্ত করে দেখা যেতে পারে। যেমন, ঐতিহাসিক উপন্যাস, সামাজিক বা গার্হস্থ্য উপন্যাস, ছোট আকারে রোমান্টিক প্রণয়কাহিনী, মনস্তত্ত্বমূলক এবং তত্ত্বমূলক। (দ্র•পৃ•-১৩-১৪)। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, বিভিন্ন ঐতিহাসিক-সমালোচক বঙ্কিমের উপন্যাসের বিভিন্ন রূপ শ্রেণীবিভাগ করেছেন। তাঁদের মতামতগুলো বিশ্লেষণ করে, একথা নিঃসংশয়ে বলা যায় - যে মাপকাঠিতেই বিচার করা হোক্ না কেন তাঁদের শ্রেণীবিভাগের মধ্যে বঙ্কিমের উপন্যাসের সার্বিক পরিচয় পাওয়া যায়না, যদিও ভিন্ন ভিন্ন ভাবে তাঁদের মতামত অবশ্যই তাৎপর্যপূর্ণ। বিভিন্ন সমালোচকের দৃষ্টিতে বঙ্কিমের উপন্যাসগুলি একই প্রকার নামে একই প্রকার শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হয়নি। তাঁদের পরস্পরবিরোধী শ্রেণীবিন্যাসের ফলে সাধারণ পাঠকেরা

পূর্বপরিচয় অনিত আনন্দ থেকে বঞ্চিত হন। উপরিউক্ত মতগুলির ভেতর থেকে কোনো একটিকে নির্দ্বিধায় গ্রহণ করা যায়না।

বঙ্কিমচন্দ্রের নিজের মতামতের গুরুত্ব স্বীকার করে নিয়েও আমরা মনে করি তাঁর উপন্যাসগুলিকে ঐতিহাসিক, অর্ধ-ঐতিহাসিক ও সামাজিক - এ তিনভাগে বিভক্ত করলে সুষ্ঠু ও সার্থক পরিচয়বাহী হবে। এ ধরণের শ্রেণীবিভাগ হবে মূলতঃ উপন্যাসে বাস্তবতার ভিত্তিতে। আখ্যানের পটভূমি ঐতিহাসিক কালের হবে এবং কাহিনী ও চরিত্রে লেখকের কল্পনার হাত যুক্ত থাকলেও সে উপন্যাসকে বলব ঐতিহাসিক আর পটভূমি লেখকের সমকালীন প্রত্যক্ষ বাস্তব সমাজজীবন হবে এবং কাহিনী ও চরিত্রে সমকালের মুখ্য ভাব অর্থাৎ বিশেষ চেতনা - দৃষ্টি মূল্যবোধ প্রতিফলিত থাকলে তাকেই বলব সামাজিক উপন্যাস। ব্যাপক অর্থে যা সামাজিক, ক্ষুদ্র অর্থে তাকে পারিবারিক বলা যেতে পারে কিনা ভাবা দরকার। এ প্রকার শ্রেণীবিন্যাসের পেছনে কাজ করে কাহিনীর বিস্তৃতি এবং সমকালীন জীবনের প্রভাব। উপরিউক্ত দুই প্রকার উপন্যাসের মধ্যবর্তী স্থানে তৃতীয় শ্রেণীর কল্পনা করা যায়। যে সকল উপন্যাসের পটভূমিতে ঐতিহাসিক / কালের পরিচয় অথচ কাহিনী কিংবা চরিত্রে লেখকের সমকালের ভাবনা - চিন্তা - চেতনা সমন্বিত বাস্তবিকতা অথবা অতীতকালের আদর্শনীতিক-আধ্যাত্মিক অনুভূতির দ্যোতনা প্রতিফলিত হয় তাদের বলা যেতে পারে অর্ধ-ঐতিহাসিক উপন্যাস। এখানে কাহিনীকাল, পটভূমি ও চরিত্রগুলি অতীতের কিন্তু ঐতিহাসিকতা নামেই, অর্থে তার ~~...~~ প্রকাশ নেই। সমকালীন ধ্যানধারণা ও অতীতকালের দুগ্ধ প্রতিফলিত হয় অতীতের কিছু অংশে প্রেক্ষাপটে। প্রকারান্তে প্রাচীন অনুভব করেন অথচ সমকালের ভাবনাকে স্থাপন করা সম্ভব হয় এমন বিশ্বাসী রূপক - প্রতীকের অন্তরালে অতীতকালের মোড়কে লেখক প্রকাশ করে থাকেন।

এ ধরণের শ্রেণীবিভাগকে অনেকে হয়তো 'ত্রুটিপূর্ণ' বলে আখ্যা দিতে পারেন কিন্তু আমাদের ধারণা এর চেয়ে যুক্তিনিষ্ঠ আর কোনোপ্রকার শ্রেণীবিভাগ সম্ভব নয়। বিশেষ কাল এবং তার প্রত্যক্ষ-বিস্তার দ্বারাই উপন্যাসকে যথার্থভাবে চেনা যায় বলে আমাদের ধারণা। সমস্যামূলক বলে ভিন্ন কোনো শ্রেণী থাকতে পারেনা কারণ সকল-প্রকার উপন্যাসের মূলেই কিছু না কিছু সমস্যার বিশ্লেষণ লক্ষ্য করা যায়। সমস্যা-~~মূলক উপন্যাসের অন্যতম~~ মূলতঃ উপন্যাসের অন্যতম সাধারণ বৈশিষ্ট্য। সমস্যাহীন,

নিখুঁত কোনো কাহিনীই উপন্যাস বলবাচ্য হতে পারেনা । তত্ত্বমূলক কিংবা উদ্দেশ্য-মূলক - এরূপ কোনো শ্রেণীবিভাগ যুক্তিসংগত নয় । কারণ, লেখক সচেতনভাবেই হোক, বা আবেগ বশেই হোক, বিশেষ উদ্দেশ্যের বশবর্তী হয়েই উপন্যাস রচনায় ব্রতী হন । উপন্যাসের মধ্যে লেখকের বক্তব্যের প্রকাশ - সেও তো বিশেষ উদ্দেশ্য ~~-~~ সাধনের নামান্তর । যেহেতু কাব্য-দর্শন-নাটক-ইতিহাস-ধর্মকথা সবকিছুই উপন্যাসের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে, একজন ঔপন্যাসিকের মুখ্যতম কাজ আত্মবিশ্লেষণ মুখ্য হতে পারে যেমনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য কোনো রাষ্ট্রীয় নীতিআদর্শ শিক্ষাদান প্রভৃতি প্রচ্ছন্নভাবে হলেও সকল উপন্যাসের মধ্যেই থাকতে পারে । সুতরাং তার ভিত্তিতে উপন্যাসের শ্রেণী-বিভাগ সঙ্কীর্ণ ও অসার্থক হতে বাধ্য । 'রোমান্টিক উপন্যাস' বলে বিশেষ শ্রেণী - নির্দেশ আমাদের ধারণায় অযৌক্তিক । কারণ, প্রত্যেক লেখকই কমবেশি রোমান্টিক । রোমান্টিকতা ~~[illegible]~~ লেখকদের অন্যতম সাধারণ ধর্ম । কোনো লেখকই বাস্তবের হুবহু প্রতিলিপি তৈরী করেন না, বাস্তব উপাদানের সঙ্গে কল্পনার খাদ মিশিয়ে তিনি নতুন সৃষ্টি করেন । যা আছে তার বাইরে যা নেই সে আদর্শসৃষ্টির উদ্দেশ্যেই রোমান্টিকতার যাত্রা শুরু হয় । বাস্তবের পাখির সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের প্রাচীর ডিঙিয়ে মনের পাখির ডানায় পারে কল্পনার সহিত আলাপন - তবুও সেই প্রভৃতি বলে । কবির 'মনোভূমি' বাস্তব অযোধ্যার চেয়ে সত্য । এই তো রোমান্টিকতা কবি - লেখকদের ধর্ম । রোমান্টিকতার স্থূল বা সূক্ষ্ম আস্তরণ বঙ্কিমের সকল উপন্যাসকেই কম বেশি আচ্ছন্ন করেছে । সেজন্য 'রোমান্টিক' বললে তাঁর উপন্যাস সম্পর্কে প্রায় কিছুই বলা হয়না । ঐতিহাসিক কালের পরিপ্রেক্ষিতে বা সামাজিক পটভূমিতে কথা বর্ণিত হয়নি বলে 'ঐতিহাসিক কালের পরিপ্রেক্ষিতহীন উপন্যাস' নামের কোনো তাৎপর্য নেই । এই সব দিক বিচার করেই আমরা বঙ্কিম-উপন্যাসকে ঐতিহাসিক, অর্ধ-ঐতিহাসিক ও সামাজিক - এই তিনভাগে ভাগ করেছি ।

দৃষ্টিভঙ্গীর স্বাতন্ত্র্য ও উদ্দেশ্যের পার্থক্যের বিচার করলে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথমতঃ সাতটি উপন্যাসকেই - যাদের মধ্যে ইতিহাসের কম বেশি যোগ লক্ষ্য করা যায় - 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' আখ্যা দেওয়া যেতে পারে । আচার্য যদুনাথ সরকারের অভিমতও তাই ।[৬১] তিনি বিস্তৃত বিশ্লেষণের মাধ্যমে দেখিয়েছেন এ সকল উপন্যাসের কাহিনীতে ঐতিহাসিক পটভূমির সাথেই বর্ণিত ঘটনাবলী যার ফলে বর্ণিত কালের মূল্য অনায়াসে

তার সমস্ত বর্ণাঢ্য সুষমা ও মাধুর্য নিয়ে পাঠকের মনে অতীত সময়ের বিশেষ প্রতীতি জন্মায়। আচার্য যদুনাথের এরূপ বক্তব্য সত্ত্বেও আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের আটটি উপন্যাসকে দু'টি শ্রেণীতে বিভক্ত করে দেখাতে পারি। বঙ্কিম শুধু 'রাজসিংহ'কে ঐতিহাসিক বলেছিলেন। তাঁর মতের প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা রেখেও আমরা রাজসিংহ সহ দুর্গেশনন্দিনী, মৃণালিনী ও চন্দ্রশেখরকে বলতে পারি ঐতিহাসিক উপন্যাস; কপালকুণ্ডলা সহ 'প্রচারের ত্রয়' আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরাণী ও সীতারামকে বলতে পারি অর্ধ-ঐতিহাসিক এবং বিষবৃক্ষ, ইন্দিরা, রাধারাণী, রজনী ও কৃষ্ণকান্তের উইল সামাজিক উপন্যাস। যুগলাঙ্গুরীয় উপন্যাস কিনা বা সাহিত্যের কোন্ শ্রেণীভুক্ত এ নিয়ে নানা প্রশ্ন, নানা সংশয় রয়েছে। তাই এ গ্রন্থকে কোনও পর্যায়ভুক্ত করে দেখানো হয়নি। তবে একে কাব্যধর্মী ঐতিহাসিক-উপকথা বলা যেতে পারে। রাধারাণী সম্পর্কেও অনেকে প্রশ্ন তোলেন। এ কাহিনীর পটভূমি যে সমকালীন বাস্তব তাতে সন্দেহ নেই। তবে 'উপন্যাস'-ধর্মীয় কাহিনী সংঘটনায় রূপকথার আতিশয্যে সত্যের - রোমান্সের সীমারেখা অতিক্রম করায় পাঠকের বিস্ময়বোধ পীড়িত হয়। তা সত্ত্বেও এ উপন্যাসকে 'সামাজিক' বলতেই হয়।

কেন এরূপ শ্রেণীবিভাগ? বঙ্কিম শুধু তাঁর 'রাজসিংহ' উপন্যাসকেই 'ঐতিহাসিক' শ্রেণীভুক্ত করেছিলেন। অন্য উপন্যাসগুলির কোনো শ্রেণী বিভাগ নেই। দুর্গেশনন্দিনীকে প্রথমে 'ইতিবৃত্তমূলক উপন্যাস' বলে চিহ্নিত করলেও পরে তা প্রত্যাহার করেছিলেন। কোনো কোনো উপন্যাস সম্পর্কে নেতিবাচক মন্তব্যের মাধ্যমে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরাণী ও সীতারামকে 'প্রচারের ত্রয়' বলেও তাদের শ্রেণীগত অবস্থানের নির্দেশ দেননি। তিনি রাজসিংহকে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলেছেন এই কারণে যে রাজসিংহে শুধু পটভূমিই ঐতিহাসিক নয় কাহিনী এবং চরিত্রগুলি ইতিহাস থেকে গৃহীত। এ জাতীয় ব্যাখ্যা সত্যই সংকীর্ণ। চরিত্রগুলি ইতিহাস থেকে গৃহীত হোক বা না হোক, দেশ-কাল-চেতনা এবং কাহিনী পরিকল্পনায় ঐতিহাসিক রস নিষ্পত্তি হলেই তাকে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলা চলে। শুধু দেখতে হবে, ইতিহাসের মূল সত্য থেকে তা যেন বিচ্যুত না হয়। দেশ-কাল পটভূমি ঐতিহাসিক হলেও সমকালীন জীবনচেতনা ও মূল্যবোধের রূপায়ন হলে সে উপন্যাসকে অর্ধ-ঐতিহাসিক বলা যায়। বস্তুত উপন্যাস মাত্রেই নির্দিষ্ট দেশকালের আধারে চিরকালের বাণীকেই বহন করে থাকে। "ঐতিহাসিক উপন্যাস ঐতিহাসিক কাল ও প্রতিবেশে ব্যক্তিগত জীবন ও ব্যক্তিগত অনুভূতির কাহিনী। ...... ঐতিহাসিক

প্রতিবেশ রচনায় এবং ঐতিহাসিক ঘটনা এবং তাহার যুগ সত্য রূপায়নে উপন্যাসের ঐতিহাসিকত্ব এবং ব্যক্তিগত জীবনের সুখ দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষার পরিবেশনে ইহার উপন্যাসিকত্ব।"[৫৩] এ কারণেই দুর্গেশনন্দিনী, মৃণালিনী, চন্দ্রশেখর(যদিও এদের মধ্যে রোমান্টিসিজমের গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশ লক্ষণীয়) এবং রাজসিংহ ঐতিহাসিক উপন্যাস। কপালকুণ্ডলা, দেবী চৌধুরাণী, আনন্দমঠ ও সীতারামে ইতিহাসের পট-ভূমি থাকলেও ইতিহাস ও উপন্যাসের উল্লিখিত প্রকার মিশ্রিত অনুপাত রক্ষা করা নেই। তাই এগুলি অর্ধঐতিহাসিক উপন্যাস। বিষবৃক্ষ, কৃষ্ণকান্তের উইল প্রভৃতি উপন্যাসে সমকালীন সামাজিক(যেখানে কোনো বড় যুদ্ধের ব্যাপক কথা অনুপস্থিত) জীবনের পরিচয় পাই; তদনুসারে সামাজিক অবস্থার উপস্থাপনা ও বিশ্লেষণ ও সমকালীন সাংস্কৃতিক প্রতিক্রিয়া এদের মধ্যে প্রকাশিত। বিধবা বিবাহ, বহুবিবাহ, সমকালীন জীবন প্রসঙ্গ, নারী ও পুরুষের সম্পর্ক বিষয়, ধর্ম ও সংস্কার পরিবর্তন ও তজ্জনিত প্রতিক্রিয়া প্রভৃতি বিষয় আলোচনাগুলোর মাধ্যমে ইহা সামাজিক গুরুত্ব অনুধাবনীয় এবং এ উপন্যাসগুলির 'সামাজিক' উপন্যাসের পরিচয় বহন করে।

॥ দ্বিতীয় অধ্যায় ॥ ॥ সূত্র নির্দেশ ॥

১। সাহিত্যের পথে, 'পঞ্চাশোর্ধ্বম' - পৃ. ২৪৮

২। বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা - পৃ. ১

৩। দ্রঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত, শিল্পলিপি - পৃ. ৮৫

৪। সাহিত্য সীমা - পৃ.৩৬৫

৪।(ক) দ্রঃ বিমল মুখোপাধ্যায়, সাহিত্যের [illegible] - পৃ. ৬৭

৫। শিল্পলিপি - পৃ. ৮৫

৬। দ্রঃ [illegible] বসু, উপন্যাসকার বঙ্কিমচন্দ্র - পৃ. ১০১

৭। গোপাল হালদার, 'ভূমিকা', বঙ্কিম রচনা সংগ্রহ (উপন্যাস খণ্ড); পৃ. - ২৫

৮। দ্রঃ - বঙ্কিমচন্দ্র, বিবিধ প্রবন্ধ, 'বাঙ্গালীর বাহুবল' - পৃ.২০৮-৯০

৯। দ্রঃ - [illegible] গোস্বামী, বাংলা উপন্যাসের ধারা - পৃ. ৩৮

১০। দ্রঃ—অরবিন্দ পোদ্দার, বঙ্কিম মানস - পৃ.৩৫০ । (সেখানেও মত, অরবিন্দ পোদ্দার এবং গোপাল হালদার প্রায় একই দৃষ্টিকোণ থেকে বঙ্কিমের মূল্যায়ন করেছেন)।

১১। বঙ্কিম রচনাবলী (সংসদ প্রকাশিত, উপন্যাস খণ্ড), 'ভূমিকা' - পৃ. ১১

১২। রবীন্দ্র-উপন্যাসের নির্মাণশিল্প - পৃ. ৩১-৩৫, ৪৩ ।

১৩। বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা - পৃ. ১

১৪। দ্রঃ [illegible] দত্ত, বাংলা উপন্যাসের উৎসসন্ধানে - পৃ.১১২

১৫। 'উপন্যাসের ভাষা' প্রসঙ্গে উদ্ধৃত লেখকদের নিজস্ব অভিমত স্মর্তব্য ।

১৬। প্রমথনাথ বিশী, 'ভূমিকা', তারকনাথের 'স্বর্ণলতা' - পৃ. ৫

১৭। দেবেশ রায়, 'উপন্যাস চিন্তা', পাণ্ডুলিপি ৩ - পৃ.৮-৯ ([illegible] ১৯৭৭)

১৮। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা উপন্যাসের কালান্তর - পৃ. ৬৯

১৯। কথা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র - পৃ. ১৭

২০। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' প্রথম খণ্ড থেকে উদ্ধৃত - পৃ.১০৯

২১। সাহিত্যে নবজাগরণ থেকে রবীন্দ্রনাথ, ১ম পর্ব - পৃ. ১১৫

২১। দ্রঃ - ডঃ অতুল সুর, বাঙলা ও বাঙালী - পৃ. ১১৭; ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা - পৃ. ২৩-২৭; ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলা কথা সাহিত্যের ইতিহাস(১ম খণ্ড) - পৃ. ২১৪

২৩। [illegible] ও [illegible] বিশ্বাস, 'ভূমিকা' - পৃ. ।৵০, ২।।০

২৪। ভক্তিমাধব চট্টোপাধ্যায়, সাপ্তাহিক বসুমতী(১৪ই জুলাই, ১৯৭০) - পৃ. ১৩

২৫। 'ভূমিকা', প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল'(১ম সং, ১৮৫৮) পৃ. ৵/.

২৬। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সম্পাদিত প্যারীচাঁদ গ্রন্থাবলী - পৃ. ১৪

২৭। ঐ ঐ 'ভূমিকা' - পৃ. ১৬

২৮। অচ্যুত গোস্বামী, বাংলা উপন্যাসের ধারা(নতুন সং) পৃ. ২৫

২৯। ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য, ভূদেবের ঐতিহাসিক উপন্যাস(সম্পাদিত), 'ভূমিকা' পৃ. ৫

৩০। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা - পৃ. ৩৫

৩১। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড - পৃ. ১২৪

৩২। [illegible] (সম্পাদিত) 'ভূমিকা' - পৃ. ১১১

৩৩। বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা - পৃ. ১১৬

৩৪। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, [illegible] উপন্যাসের [illegible] - পৃ. ১২-১৫

৩৫। [illegible], 'মধুমতী' - পৃ. ১৩০(র.রচনাবলী, ৩য় খণ্ড)

৩৬। এ বিষয়ে পূর্বেও কিছু বলা হয়েছে। বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : ডঃ কার্তিক লাহিড়ী, [illegible] ও বাংলা উপন্যাস - পৃ. ১৩-৬১

৩৭। দ্রঃ - ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা - পৃ.৬

৩৮। অচ্যুত গোস্বামী, বাংলা উপন্যাসের ধারা - পৃ. ১৪

৩৯। Rene Wellock & Austin Warren - Theory of literature/P-232

৪০। '[illegible] বা কথাপুরুষের উপকথা', [illegible] শুক্ল সম্পাদিত [illegible] : নির্বাচিত রচনাসংগ্রহ - পৃ. ১০৩

৪১। ওয়েলেক ও ওয়ারেন, থিয়োরী অব লিটারেচার - পৃ. ১১৩

৪২। Bankim Rachanavali, Vol-III(Sahitya Samsad)/ P-110.

২৩। বঙ্কিম রচনা সংগ্রহ (১ম খণ্ড), পরিশিষ্ট - পৃ. ৭

২৪। রবীন্দ্রনাথ, সাহিত্য, 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' - পৃ. ১০৬

২৫। 'ভূমিকা', অর্দ্ধেন্দুকুমার সেনগুপ্ত, বাংলা ঐতিহাসিক উপন্যাস - পৃ. ১

২৬। অর্দ্ধেন্দুকুমার সেনগুপ্ত, বাংলা ঐতিহাসিক উপন্যাস, 'ঐতিহাসিক উপন্যাসের পরিচয়' - পৃ. ৭ থেকে উদ্ধৃত।

২৭। ড: মধুসূদন ভট্টাচার্য, বঙ্কিম সাহিত্য - পৃ. ৭ এবং ব্রজেন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত, সাহিত্য সাধক চরিতমালা (২য় খণ্ড) - পৃ. ৩৭

২৮। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড - পৃ. ১১৮-১৯

২৯। যদুনাথ সরকার, 'ভূমিকা', রাজসিংহ (শতবার্ষিক সংস্করণ)। [তিনি সাতটি উপন্যাসকে 'ঐতিহাসিক' বলেছেন।]

৩০। প্রফুল্লকুমার দাশগুপ্ত, উপন্যাস সাহিত্যে বঙ্কিম - পৃ. ১৮-১৯ থেকে উদ্ধৃত।